ষষ্ঠ অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনা : সম্পর্কের সন্ধানে

৬. সূচনা

৬.১ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

৬.২ উচ্চবর্গের 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ

৬.৩ উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি : দুটি স্বতন্ত্র ধারা

৬.৪ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার নিরিখে

৬.৪.১ নিম্নবর্গের প্রগতিশীল চেতনা

৬.৪.২ নিম্নবর্গের কুসংস্কার ও অদৃষ্টে বিশ্বাস

৬.৪.৩ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা

৬.৫ সারাংশ ও সিদ্ধান্ত

৬. সূচনা

একজন ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করবেন, একজন সাহিত্যিক হিসাবে নিম্নবর্গের আবিষ্কার কিন্তু সেরূপ হবে না। এর মূল কারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ। এই ভাবনা আমাদের বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ তৈরির ওপর ক্রিয়াশীল। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে অন্বেষণ করেছি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা নিম্নবর্গকে যেভাবে দেখেছেন, একজন সাহিত্যিক হিসাবে হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে সেভাবে দেখছেন কি না, বা নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর আখ্যানে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে কি না। মূলত সমালোচকদের আবিষ্কৃত নিম্নবর্গীয় চেতনার সঙ্গে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যের সম্পর্ক সন্ধান করাই আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

লক্ষণীয় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম চারটি খণ্ডে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের পটভূমিতে কৃষক বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার যাবতীয় দলিল, দস্তাবেজের নিরিখে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের স্বকীয়-স্বতন্ত্র স্বরকে অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য বাঁক সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চম-খণ্ড ও তার পরবর্তী সমালোচনাগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ে এসে ঐতিহাসিক-গবেষকেরা অনুধাবন করতে পারলেন যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের গবেষণা থেকে নিম্নবর্গীয় চেতনার বিশুদ্ধ রূপের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। নিম্নবর্গের ইতিহাস যে ক্ষমতাশীল ও ক্ষমতাহীন নানা শ্রেণিচেতনার বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ—এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করা হল। ফলে নিম্নবর্গের আসল বৈশিষ্ট্য কী—এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী আলোচনায় যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালের আলোচনায় সেই প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়াল এই যে, ইতিহাসে উচ্চবর্গের বিপরীতে অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে প্রদর্শিত ও প্রতিনিধিত্ব করানো হয়। সুতরাং প্রশ্ন পরিবর্তনের ফলে নিম্নবর্গের ইতিহাসকে পুনর্মূল্যায়ন করার নব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রশ্ন তুললেন,

> '...ইতিহাস রচনার প্রতিটি উপাদানই যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই 'কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে অত ঘটা করে বিশুদ্ধ কৃষকচৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতির স্লোগান আওড়াতে হচ্ছে কেন?... ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটা তো নিতান্তই গল্পকথা। ...আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র। নিম্নবর্গকে ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত করছেন। নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৬-১৭)

তাঁর মতে, নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের উচিত উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নির্মাণ করার কৌশলগুলির অনুসন্ধান করা। কারণ ইতিহাসের শত-সহস্র কণ্ঠস্বরের মাঝে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের স্বকীয় কণ্ঠস্বরকে চিহ্নিত করা বৃথা। আসলে ঐতিহাসিক আমাদের সামনে নিম্নবর্গকে যেভাবেই তুলে আনুন না কেন, তা আসলে নিম্নবর্গের নিজের কথা তো নয়, অন্যের দ্বারা নির্মিত বা আরোপিত কথা। তাই নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, তার সামাজিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই একজন ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য।

এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক জহর সেনমজুমদার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্তব্য করেন, স্পিভাক যে উপরিউক্ত ঐতিহাসিককে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করার জন্য চাইছেন, বাস্তবে সেই নিরপেক্ষ, দিকনির্ণয়ী ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি সেক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলেন, 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণের প্রক্রিয়াটির অনুসন্ধানের বাস্তব প্রত্যাশা কেবল একজন ঐতিহাসিকের কাছ থেকেই কেন করলেন স্পিভাক? সেই বাস্তব প্রত্যাশা তো তিনি একজন সাহিত্য স্রষ্টার কাছ থেকেও করতে পারতেন। কারণ একজন সাহিত্যিকও ঐতিহাসিকের মতোই গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ-বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য রচনা করেন। যদিও এক্ষেত্রে বলতে হয়, একজন ইতিহাস রচয়িতা এবং একজন সাহিত্য স্রষ্টা উভয়ই সামাজিক মানুষ। কিন্তু একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করলেও, তিনি আশ্রয় নেন বহু প্রামাণ্য তথ্য, সত্য ও তত্ত্বের। কিন্তু একজন সাহিত্য স্রষ্টার সে দায় থাকে না। কারণ একজন সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিভাব ও অভিজ্ঞতা থেকে লেখা শুরু করলেও ঐতিহাসিকের মতো তথ্য, সত্য ও তত্ত্বকে সর্বদা গুরুত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে না। (সেনমজুমদার ২০০৭, পৃ. ৩৫) স্পিভাক বলেছেন নিম্নবর্গ তার নিজের কথা নিজে কখনো বলতে পারে না। কারণ ইতিহাসে নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়েছে একজন ঐতিহাসিক দ্বারা, যা অন্যের নির্মাণ। এক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যে নিম্নবর্গের নির্মাণও সেই হিসেবে অন্যের নির্মাণই বটে। তাইতো জহর সেনমজুমদার প্রশ্ন তোলেন,

> 'নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য কিংবা নিম্নবর্গের সঠিক সামাজিক অবস্থানজাত ইতিহাস জানবার জন্য বিশেষ ব্যক্তিসংগঠিত ইতিহাসবিদ্যা নয়, নির্বিশেষে সাহিত্যই কি ভীষণভাবে ভরসা হয়ে উঠতে পারত না? তাহলে স্পিভাক বা রণজিৎ গুহ ইতিহাসবিদ্যা অপেক্ষা সাহিত্যকে কেন ইতিহাসের প্রতিরূপে সামনে রাখলেন না?'
>
> (সেনমজুমদার ২০০৭, পৃ. ৩৬)

তবে এ কথা ঠিক যে, ইতিহাসের মধ্যে যে বাস্তব সত্য উঠে আসে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে উঠে আসে না। কিন্তু স্পিভাক নিজেও নারীর সামাজিক অবস্থানকে পরিস্ফুট করে তাকে নিম্নবর্গের আওতায় প্রদর্শিত করার জন্য মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী', 'দ্রৌপদী', 'অরণ্যের অধিকার' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রশ্ন আসে, কেন তিনি সাহিত্য সংরূপকে তাঁর আলোচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেন। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের সঙ্গে সাহিত্যিকের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'A Literary Representation of the Subaltern : Mahasweta Devi's 'Stanadayini''-প্রবন্ধে দিয়েছেন,

> That history deals with real events and literature with imagined one may now be seen as a difference between cases of historical and literary events will always be there as a differential moment in terms of what is called 'the effect of the real'. what is called history will always seem more real to us than what is called literature. ... and that historiography and literary pedagogy are disciplines.'
>
> (Guha (ed.) 1987, p.94-95)

অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা ও সাহিত্যিক ঘটনার বিভাজন আসলে উভয়ক্ষেত্রেই গবেষণার দাবি করে। স্পিভাক তাই বলেন, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কল্পকাহিনিতে যা কিছু বলেন তা তিনি প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করেন। 'স্তনদায়িনী'-র যশোদা, 'দ্রৌপদী' গল্পের দ্রৌপদী, 'অরণ্যের অধিকার'-এর বিরসা মুন্ডার সার্থকতা হল, চরিত্রগুলি সর্বজনগৃহীত একটি অনুমান দ্বারা কল্পিত ও পরীক্ষিত। একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তেও চরিত্রগুলি নিম্নবর্গ রূপে বিদ্যমান থাকতে পারে।

কিন্তু একজন নিম্নবর্গের ইতিহাসকার একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত কল্পনা করেন যাতে রচিত ইতিহাসটি একটি সুসঙ্গত রূপ নিতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকের কল্পনা বা অনুমানগুলি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে খুব বেশি আলাদা হয় না। কিন্তু যারা সাহিত্য পড়েন বা লেখেন তারা নিম্নবর্গকে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেন। প্রকৃতপক্ষে মূল পার্থক্যটি হল এই যে, ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক যখন নিম্নবর্গকে তাদের রচনায় প্রদর্শিত করছেন তখন একজন সাহিত্যিক নিম্নবর্গকে 'অবজেক্ট' হিসেবে কল্পনা করেন এবং ঐতিহাসিক তাকে 'বাস্তব' বলে মনে করেন। স্পিভাকের ভাষায়,

> 'The difference is that the subaltern as object is supposed to be imagined in one case and real in another. I am suggesting that it is a bit of both in both cases. The writer acknowledges this by claiming to do reasearch… I hope it will be admitted that my brief is very different from saying that history is only literature. (Guha (ed.) 1987, p. 95-96)

স্পিভাক সাহিত্যের আকল্পের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের স্বরকে খোঁজার ইঙ্গিত দিলেও তাঁর উদ্দেশ্য গবেষণাধর্মী সাহিত্য। কারণ নিম্নবর্গের চেতনার প্রদর্শনের দিক থেকে ভাবলে সাহিত্যের মধ্যে থেকেও নতুন তাত্ত্বিক

দৃষ্টি উন্মোচনের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই সেই সাহিত্যে ইতিহাসকে বহু দিক দিয়ে নয়, বরং নিম্নবর্গের সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের যুগস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক ভাবে গড়ে তুলতে হবে। তবে একথাও ঠিক যে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাতা নিম্নবর্গকে যতটা দেখতে পান, তার থেকে অনেক বেশি নিম্নবর্গকে ধরা যায় সাহিত্যের আকল্পের মধ্যে। তা যদি না হতো, তাহলে স্পিভাক মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য গবেষণার প্রসঙ্গ আনতেন না। শুধু স্পিভাক কেন, গৌতম ভদ্র তাঁর 'কথকতার নানা কথা' প্রবন্ধে প্রত্যক্ষভাবে লোককথা, প্রচলিত লোকসাহিত্য, পুরাণ, লোকগানের মাধ্যমে নিম্নবর্গের স্বর ও চেতনার সন্ধান করেছেন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৯১-১৫১) আবার রণজিৎ গুহ-ও তাঁর 'একটি অসুরের কাহিনি' নামক প্রবন্ধের সূচনাই করেছেন ধর্মের বিশেষ রূপ মৌখিক লোককথার মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনার কথা বলে। যে সব তথ্য বা দলিল দস্তাবেজের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস লেখা সম্ভব তার প্রাচীনতম সংকলন রয়েছে ধর্মে। আধিপত্য ও অধীনতা সম্পর্কের স্বরূপগুলি কর্তৃত্ব, সহযোগিতা আর প্রতিরোধের নিয়মে সেখানেই রয়েছে। এর মূলে রয়েছে কিছু ক্ষমতার বিধান; ইতিহাসে তার উচ্চারণ স্পষ্ট।

> 'ফলে ক্ষমতার প্রতি উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের যে মনোভাব তার এক পুঞ্জিভূত তথ্য সমগ্র গড়ে ওঠে। আর প্রকাশ আমরা দেখি কখনো পৌরাণিক কাহিনিতে, কখনো বা আচার অনুষ্ঠানে, আবার কখনো রীতিনীতিতে, অথবা বিশ্বাসের জগতে পূর্বোক্ত উপকরণসমূহের বিচিত্র যোগাযোগের বিভিন্ন উপন্যাসে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৬৭)

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে ইতিহাসের তথ্য সমগ্রের পুঞ্জিভূত হওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং 'রাহু' নামক পৌরাণিক অসুরের ছয়টি উপাখ্যানের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন কীভাবে পুরাণ কথার মধ্যে ক্ষমতার শৃঙ্খলায় প্রভুত্ব ও অধীনতার রূপকল্পটি লুকিয়ে আছে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৬৭-৮৫) দেখা যাচ্ছে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বা রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের নির্মাণ কৌশল বা পদ্ধতি অনুসন্ধানের জন্য একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ওপর নির্ভর করলেও তারা নিজেরাই কিন্তু সাহিত্যের রূপকল্পের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের যোগসূত্রের কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে স্পিভাক যদিও বিশেষভাবে গবেষণাধর্মী ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ এনে একজন সাহিত্যিক দ্বারা নিম্নবর্গকে বেশি মর্যাদা দানের কথা বলেছেন। এই সূত্র ধরেই আমরা বলতে চাই যে একজন সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার আকল্প যদি গবেষণাধর্মী হতে হয় তাহলে হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যের মধ্যেও আমরা স্পিভাক কথিত গবেষণাধর্মিতা লক্ষ করেছি। যে প্রসঙ্গ ও কারণে তিনি মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গের

ইতিহাস সন্ধানের আকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই একই প্রসঙ্গ ও কারণে আমরাও আমাদের গবেষণায় হরিশংকরের কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আকল্প বা প্রতিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছি।

ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে সে হিসেবে হরিশংকর সর্বপ্রথম একজন জেলেসন্তান, তারপর তিনি একজন লেখক। একজন জেলেসমাজের ব্যক্তি যখন তাঁরই সমাজের কথা রচনা করেন, তখন তার থেকে প্রত্যক্ষ গবেষণা আর কী হতে পারে। যার সফল উদাহরণ 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'প্রস্থানের আগে' ও 'অর্ক' উপন্যাস। তাছাড়া জেলেসমাজ সম্পর্কিত ছোটোগল্পগুলিও রয়েছে। শুধু তাই নয়, নিষিদ্ধপল্লির পতিতাদের নিয়ে লেখা 'কসবি', মেথরসম্প্রদায় নিয়ে 'রামগোলাম', কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে রচিত 'মোহনা' উপন্যাসের পেছনেও যে লেখকের গভীর গবেষণা রয়েছে তা আমরা লেখকের জবানিতেই শুনে নিতে পারি। 'দহনকাল' উপন্যাস সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন,

> 'দহনকালের কাল হলো ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১। ১৯৭১ আমার নিজের চোখে দেখা। ১৮ বছরের তরুণ তখন আমি। স্বাভাবিকভাবে '৭১-এর যুদ্ধকাল এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার মানুষও একাত্তরের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। তারাও ঠেকিয়েছিল পাঞ্জাবি সেনা আর রাজাকার-আলশামসদের। ওই ঘটনা আমি তুলে ধরেছি দহনকালে। দেখাতে চেয়েছি, জেলেদের মতো প্রান্তজনেরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।'(জলদাস ২০১৮, পৃ. ১৬০)

জেলেদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাঁর 'অর্ক' উপন্যাসটিও। শুধু জেলেরাই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষেরাও যে এই যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং পঙ্গু অবস্থায় ফিরে এসে এক রাজনৈতিক চক্রান্তে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল—সেই বাস্তব ঘটনাগুলির জলজ্যান্ত উদাহরণ হল-'সীমানা ছাড়িয়ে', 'থুতু', 'আহব ইদানিং', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'একজন জলদাসীর গল্প' প্রভৃতি গল্পগুলি। অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য-

> 'কসবি লেখার আগেই রামগোলাম লেখার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু রামগোলাম লেখার তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি ছিল তখন। তাছাড়া আমার মনে হয়েছিল হরিজনদের সঙ্গে যে তিন বছর মিশলাম, তা উপন্যাস লেখার জন্য যথেষ্ট নয়। আরো বেশি তথ্যের জন্য, তাদের সঙ্গে আরো বেশি সময় নিয়ে মিশবার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম। ... দীর্ঘ ৫-৬ বছর হরিজনদের সঙ্গে মেলামেশার পর একসময় আমার মনে হল—এখন লেখা যায়। তাই রামগোলাম লিখতে বসলাম।' (মুহাম্মদ ২০১৭, পৃ. ৫৫)

আবার 'মোহনা' উপন্যাস লেখার পেছনে লেখকের ভাবনা এরকম-

> '...ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার হাজারো সমস্যা। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা, ঘটনাপরম্পরা ঠিক রাখা, সময়-সংলাপ-পটভূমি এসব দিকে কড়া নজর রাখা। মনে হলো, ঠিকঠাক মত প্রস্তুতি না নিয়েই উপন্যাস লিখতে বসেছি আমি।...শুরু করে দিলাম বঙ্গদেশের ইতিহাস বিষয়ে পাঠ নেওয়া।...

কিন্তু গবেষণা আর ফিকশন এক কথা নয়। উপন্যাসের জন্য ওই সম্প্রদায়ের বিষয়ে আরো গভীরতর জানা-শোনা দরকার। এই সময় আমার হাতে এল শঙ্কর দে (দেঁড়ে)-র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জেলে কৈবর্ত আদি কলকাতার জেলেপাড়া, জেলেপাড়ার সঙ বইটি। বইটি আমার পড়াশোনাকে অনেক দূর এগিয়ে দিল। আমি পুনরায় মোহনা উপন্যাসটি লিখতে বসলাম।' (জলদাস ২০১৮, পৃ. ২১৩-১৪)

অন্যদিকে 'কসবি' উপন্যাস সম্পর্কে লেখককে এক সাক্ষাৎকারে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি উপন্যাসের প্রয়োজনে পতিতাদের সম্পর্কে জানতে পতিতাপল্লিতে গিয়েছেন কি না? সেই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন,

'বিদেশের এবং ভিন্ন জেলার পতিতাপল্লীতে যাওয়া হয়নি আমার। তবে যে-পাড়াকে পটভূমি করে 'কসবি' লিখিত হয়েছে, ওই পাড়াটি আমার দেখা, ভালো করে দেখা। বারবার ঘুরেছি আমি ওই পাড়ায়—বাল্যবয়সে। তরুণ বয়সে এমনকি প্রৌঢ় বয়সেও লেখা এবং দেখার প্রয়োজনে বারবার গেছি আমি সাহেবপাড়ায়। বাল্য ও তারুণ্যের ঔৎসুক্যে এবং প্রৌঢ় বয়সে শেখার প্রয়োজনে ওই পল্লীতে গেছি আমি।' (জলদাস ২০১২(ক), পৃ. ৯৮)

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট, হরিশংকর জলদাস শুধুমাত্র একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ বলেই যে তিনি নিম্নবর্গ প্রধান সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেছেন, তা নয়। এর পেছনে রয়েছে তার গভীর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা। কারণ তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নিম্নবর্গ কেবল সাহিত্য বিনোদনের বাহক মাত্র নয়, বরং তাঁর গল্প-উপন্যাসে ইতিহাসের বিভ্রমে সৃষ্টি হাওয়া ঘটনাবলিকে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে শাসক ও শোষিতের দ্বান্দ্বিক স্বরূপের পাশাপাশি তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও স্পষ্টরূপে উঠে এসেছে। ফলে ইতিহাসের মতো হরিশংকরের সাহিত্যে সামাজিক পদ্ধতিগত বিন্যাসে নিম্নবর্গ কেবল অন্যের নির্মাণ হয়ে থাকেনি বরং নিজ অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে একজন ঐতিহাসিকের মননদৃষ্টি নিয়েই উপস্থিত হয়েছে।

৬.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

বর্তমান অভিসন্দর্ভে এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় মূল আলোচ্য বিষয়টি হল সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরোধিতা করে দক্ষিণ এশিয় ইতিহাসচর্চার অভ্যন্তরে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার স্বতন্ত্র ক্ষেত্রটিকে অনুসন্ধান করা। এক্ষেত্রে গবেষকদের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনার বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রায়শই বিরোধী ইতিহাস হয়ে উঠেছে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৩) সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাসকে প্রদর্শিত করতে গিয়ে সমালোচকেরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গণ ও কৃষক বিদ্রোহকে দমন

করতে গিয়ে যেমন তাদের রাজনীতি, প্রতিবাদী চেতনা ও শ্রেণিচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনই পরবর্তীকালে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ ও নারীর অবস্থানের বিষয়টিকেও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় ১৯৮২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সাবঅলটার্ন স্টাডিজের বারোটি খণ্ডে মোট পঁচানব্বইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে মূলত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের চেতনা ও নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ আলোচিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, কৃষক আন্দোলন ও তাদের ব্যর্থ প্রতিবাদ, উপজাতির আন্দোলন, নারীর সামাজিক অবস্থান, জাতিভেদ জনিত সমস্যা প্রভৃতি আলোচনার ভরকেন্দ্র মূলত সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গই। ঐতিহাসিক নথি-দলিল-দস্তাবেজে নিম্নবর্গীয় চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। ইতিহাসের নথিপত্র নির্মিত হয়েছে উচ্চবর্গ দ্বারা। সেক্ষেত্রে সেখানে নিম্নবর্গকে কেবল উচ্চবর্গের অধীনস্তের ভূমিকাতে লক্ষ করা গিয়েছে। একমাত্র বিদ্রোহের মুহূর্তেই শাসকগোষ্ঠীর চেতনায় নিম্নবর্গীয় চেতনার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচকরা বিদ্রোহ দমনের মুহূর্তগুলিকে গুরুত্ব সহকারে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা গেল, শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা নানা আন্দোলনগুলির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনার নথি পেশ করেছেন, সেই তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনার নথিগুলি নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকেরা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার ফলে কৃষকদের বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চেতনা পরিচয় উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচকেরা নতুন করে দেখালেন যে, কৃষকচেতনায় কেবল বিদ্রোহী মানসিকতাই নয় এর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে তাদের ধর্মভাব, অলৌকিকতা, দৈবশক্তি, বিশ্বাস, অলীক কল্পনা, অদৃষ্টের প্রতি আস্থা-র মত বিষয়গুলি যা কোনোভাবেই উপেক্ষার বিষয় নয়। কারণ এই বিশ্বাস ও আস্থা নিম্নবর্গের চেতনাকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় করে তোলে। ফলে কৃষক চেতনার স্বকীয়তা অনুসন্ধানের জন্য বিদ্রোহী প্রতিবাদী চেতনাকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনই পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন অধীনতার জীবনযাপনের ভেতরেও কৃষক চেতনার বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজের সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। **i)** সাম্প্রদায়িকতা **ii)** জাতিভেদ প্রথা ও **iii)** নারী সংক্রান্ত আলোচনা। এই তিনটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য ধরা পড়েছে। হরিশংকর একজন গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে নিম্নবর্গের বয়ান রচনা করেছেন। সুতরাং

সেখানে অনিবার্যভাবে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার অভিঘাত। পাশাপাশি উঠে এসেছে প্রতিনিয়ত অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী দ্বারা তথাকথিত জেলে, মেথর, পতিতা, মুচি, তথা নিম্নবর্গের শোষণ-বঞ্চনার নির্লজ্জ ইতিহাস। আর এই সবই ক্রোধ অপমান যন্ত্রণা ও প্রতিবাদে হরিশংকর জলদাসের জীবনে ও সাহিত্যকর্মের নানা আকল্পে ধরা পড়েছে।

৬.১.১ সাম্প্রদায়িকতা : ইতিহাসে ও কথাবিশ্বে

সম্প্রদায়গত বা সাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রথম থেকে কার্যকর ছিল। কৃষকের সাম্প্রদায়িক চেতনা কীভাবে একটি কৃষক বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করেছিল তা ধরা পড়ে তাঁর 'Agrarian relations and communalism in Bengal, 1926-35' ও 'More on modes of power and peasantry' দুটি প্রবন্ধে। আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। যথা সাম্প্রদায়িক, সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাক্‌শিল্প সমাজে অবস্থান করেছিল। এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমগ্র সমর্থকদের ওপর ন্যস্ত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর ব্যাখ্যায় বলেন-

> 'Here the collective is prison; individual or sectional identities are derived only by virtual of membership of the community… Communal authority may be exercised through a council or elders or of leading families, or even by a chief or patriarch. The point is that authority resides not in the person or even in the office; it resides only in the community as a whole. The officials and councils are no more than mere functionaries.' (Guha (ed.) 1983, p. 317)

আসলে সম্প্রদায়ের ধারণা একটি জীবন্ত শক্তি হিসেবে অব্যাহত ছিল কৃষক চেতনায় এবং সামন্ত ও রাষ্ট্রের দালালরা তাদের কাছে বহিরাগত হিসেবে থেকে যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে পূর্ব-বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

যদিও হরিশংকরের কথাসাহিত্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথিত দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে দেখতে গেলে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। কারণ পূর্বে উল্লেখিত রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সহাবস্থানের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের স্থান এখন বহু বিভাজিত হয়ে সামাজিক ক্ষমতার শৃঙ্খলায় বিভিন্ন রূপে অবস্থান করেছে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তথাকথিত নিম্নবর্গের কাছে বহিরাগত হলেও বিশ্বে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয়েছে মূলত বহির্বিশ্বে গঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা 'দহনকাল' উপন্যাসটি দেখি তাহলে দেখা যাবে,

'ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারতশাসিত কাশ্মীরে হঠাৎ করেই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাঁধে। সেই দাঙ্গার ঢেউ প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ে ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে। চট্টগ্রামও সেই বীভৎস দাঙ্গার গ্রাস থেকে রেহাই পায় না। উত্তর পতেংগার মতো নিভৃত অচঞ্চল গাঁয়েও দাঙ্গার জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১০৯)

উপন্যাসে আরো জানা যায় যে, সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় বিহারি-মুসলমানরা পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করে পাকিস্তানি শাসকদের আশ্রয়ে একটি শক্তিশালী আস্তানা গড়ে তোলে। তারা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। হিন্দু প্রধান গ্রামে আক্রমণ, লুঠ-পাট, ধর্ষণের মতো গর্হীত অপরাধের মধ্য দিয়ে হিন্দু- মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় তারা। হামিদকে দেখি হিন্দু জেলেদের প্রতি হঠাৎই সম্প্রীতির ব্যবহার ত্যাগ করে তাদের ওপর অন্যায়ভাবে প্রভাব খাটাতে। জেলেদের ধরা মাছ তারা কেড়ে নেয় এক অলিখিত অধিকার বশে। এমদাদ তাই বিনা দ্বিধায় নিকুঞ্জর ছেলেকে বলতে পারে-

'অই ডোমর পোয়া অল, ইয়ান পাকিস্তান, মুছলমানর দেশ। তোরা মালাউন অল এন্ডে থাইত্ পাত্তি নো। যদি থাকস ইচা মাছ অই থাগিবি। আঁরা যিয়ান কই হিয়ান গরিবি।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১০)

হামিদ-এমদাদ-সিরাজ-সাইদুল এদের সঙ্গে জেলেদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি। কিন্তু বহির্বিশ্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জেরে এদের এরূপ মানসিকতা হিন্দু জেলেদের মনে প্রশ্ন জাগায় যে,

'...আজ তাদের ভাষা এত খারাপ হয়ে উঠল কেন? কোনো দুষ্টবুদ্ধি তাদের মাথা বিগড়ে দিল?'(জলদাস ২০১০,পৃ.১১০)

এর উত্তর পাওয়া যায় ইতিহাস থেকে। যেখানে সম্প্রদায়ের ধারণা একটি জীবন্ত শক্তি হিসেবে বারবার অব্যাহত ছিল কৃষক চেতনায়। তাইতো বাইরের সাম্প্রদায়িকতার ঘটনা সেই জীবন্ত শক্তিকে ত্বরান্বিত করে খুব সহজেই। হঠাৎ করেই জেলেরা মুসলমানদের কাছে 'ইচা মাছ' হয়ে যায়। 'মুছলমানর দেশ' বলে তারা নিজেদের আধিপত্য শ্রেণি হিসেবে জেলেদের বিপরীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। একথা তো স্বাভাবিক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বভাবতই নিম্নবর্গ। তাইতো একই সমাজকাঠামোয় একই শ্রেণির মানুষ হয়েও জেলেরা মুসলমানদের কাছে নিম্নবর্গে পরিণত হয়েছে।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সপ্তম খণ্ডের বিবিধ প্রবন্ধে ধর্মসম্প্রদায় ক্ষমতা ও নিম্নবর্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের 'The colonial constraction of Communal : British Writings on Banaras in the Nineteenth Century' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশরা তাদের অনুশাসন নীতিকে সুশৃঙ্খল করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে গল্পের আকারে ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রতি প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে দমিয়ে রাখার কৌশলগুলি রাষ্ট্রের ইতিহাসে 'সাম্প্রদায়িক কলহের' নামে সংক্ষিপ্ত রূপ

নিয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপ বলে ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশরা নিজেদের দমননীতিকে বড়ো করে দেখিয়েছে (Guha (ed.) 1989, p. 152) অর্থাৎ বেনারসের সাম্প্রদায়িকতার জেরে গঠিত নানা সময়ের দাঙ্গার ঘটনাকে কেবলমাত্র 'কলহের' নামে এর আসল কারণগুলি চাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হরিশংকর 'অর্ক' উপন্যাসে দেখাচ্ছেন কীভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রভাবে হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা ও প্রতিশোধস্পৃহা। ভারতীর সৈন্যের মৃত্যুর খবরে পাকিস্তানবাসীদের আনন্দ, পোস্টার লাগিয়ে উল্লাস আসলে যে পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারের উল্লাস তা বোঝা যায়, যখন দিবাকর স্কুলে গিয়ে মুসলিম ছাত্রদের কটাক্ষের শিকার হয়। একটা সময় যখন পতেঙ্গার মুসলমানরা হিন্দুদের 'ইন্ডিয়ার গুপ্তচর' ভাবা শুরু করে তখন দিবাকর দেখে-

> 'এই যে সন্দেহ, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় হিন্দু আর মুসলমানের মনের মধ্যে হঠাৎ করে চাগিয়ে উঠল।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৪১)

এই সময় এক রাতে কানাই দর্জিকে খুন করা হয়। একজন মুসলমান কানাইকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচর ভেবে তাকে হত্যা করে। এই ঘটনায় পতেঙ্গার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শোরগোল হলে হিন্দুরা প্রাণ হারানোর ভয়ে একেবারে নিষ্ক্রিয়-নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের এই নিষ্ক্রিয়তায় মুসলমানরা নিজেদের আরো শক্তিশালী মনে করলে হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। দেখা গেল রাজনৈতিক অধিকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিভাজিত হয়ে একে অপরের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করানোর জন্য মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচার শোষণ বঞ্চনা ও নিপীড়ন অভিশাপের মতো তাদের ওপর নেমে এসেছে। তাইতো বলরাম যখন ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে তখন ছোবান মেম্বার রুক্ষ স্বরে বলে উঠেছিল,

> 'ক্যান, যাবি না ক্যান? চইলে যা, চইলে যা। কত স্বপ্ন দেখলাম তোর বাড়িটারে লইয়া। একটা মসজিদ...'
>
> (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৭৯)

'থুতু' গল্পে বিমল শীলের উপর বশিরউদ্দিনের যে অন্যায় প্রদর্শিত হয়েছে তার মতো সাম্প্রদায়িকতার প্রতিচ্ছবি আর কোথাও উঠে আসেনি। আমরা দেখলাম, বিমল বশিরউদ্দিনকে আদাব না করে পাশ কাটিয়ে চলে আসার অপরাধে তার পরিবারকে বশির মসজিদে জোর করে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করে।

তাহলে দেখা গেল, উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া নানা রাজনৈতিক অভিঘাতে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গ যেমন শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত ও অবহেলিত ছিল তেমনই উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বতন্ত্র বাংলাদেশেও নিম্নবর্গরা একইভাবে শোষিত ও অবহেলিত। রাজনৈতিক পালাবদল ক্ষমতার হস্তান্তর হলেও

নিম্নবর্গের অবস্থা একই রকম থেকে যায়। উচ্চবর্গ দ্বারা রচিত প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিপরীতে হরিশংকর জলদাস তাঁর 'দহনকাল', 'অর্ক', থুতু, 'সীমানা ছাড়ায়ে', 'আহব ইদানীং', 'দইজ্যা বুইজ্যা' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসকে স্থান দিয়েছেন। আর এই বিকল্প কথাবিশ্বের আকল্পে ও বয়ানে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

৬.১.২ জাতিভেদ প্রথা : আখ্যানের আকল্পে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

প্রাবন্ধিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে জাতিপ্রথাকে মানুষের মধ্যে পরিচয় ও পার্থক্য সৃষ্টির পেছনে সন্দেহ করার জোরালো কারণ আছে। জাতিপ্রথা শুধুমাত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, এটি দৃষ্টান্তমূলক ফর্ম হিসেবে কাজ করে। 'জাতি' শব্দটি ভারতবর্ষে বর্ণ হিসেবে নয় বরং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তা সমগ্র জাতি-উপজাতি, ভাষাগোষ্ঠী, ধর্মীয়গোষ্ঠী ও জাতীয়তা হিসেবে ধরা পড়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ তাৎপর্য হল,

> 'The extent to which a caste-like system provids the cultural from for conceptualizing relations of domination, as well as of resistance, between social groups needs to be examined in its concreteness.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 17)

নিম্নবর্গের ইতিহাস-এর প্রেক্ষিতে জাতিভেদ প্রথাকে আধিপত্য ও অধীনতার কারণ হিসেবে দেখা হয়েছে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে লক্ষ করলে দেখা যাবে 'জাতি' শব্দটি ধর্মীয়গোষ্ঠী, পেশাগোষ্ঠী ও জাতীয়তা হিসেবে ধরা পড়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে উক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে জলপুত্র, দহনকাল, একলব্য, প্রস্থানের আগে, সুখলতার ঘর নেই, মোহনা, রামগোলাম উপন্যাস ও 'তুমি কে হে বাপু', 'সুবিমলবাবু', 'কোটনা', 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে জাতিভেদ প্রথার কারণে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতি যে শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করেছি। বর্তমান পরিসরে আমরা খুব সংক্ষেপে দেখে নেব হরিশংকরের উপন্যাস-গল্পগুলির আকল্পে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাজনিত কারণগুলির মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের বিনির্মাণকে।

প্রথমত, 'জলপুত্র' উপন্যাসে গঙ্গাকে স্কুলে ভর্তি করানো হলে সে স্কুলে যেতে চায় না। কারণ স্কুলের অধিকাংশ হিন্দু ছাত্ররা তার সঙ্গে জাতিভেদ জনিত ঘৃণায় দূরত্ব বজায় রেখে চলে। জেলে বলে গঙ্গাকে 'জাইল্যা', 'ডোম' বলে ঘৃণা প্রদর্শন করে। আবার অনুষ্ঠান বাড়িতে প্রদীপ ঢুইল্যাদের নিজেদের এঁটো তাদেরই নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে বলা হয়। সমাজে মান্য তথাকথিত বর্ণ হিন্দুদের এই আচরণ আসলে বর্ণ প্রথারই এক কুৎসিত রূপ। কারণ জেলেদের 'ডোম'-দের সঙ্গে এক সারিতে রাখার

মানসিকতা জাতিভেদ প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজের একাংশকে অধীন করে রাখার প্রবণতাকেই স্পষ্ট করে। জন্মসূত্রে জাতি নির্ণয় ও জাত অনুযায়ী পেশা-বৃত্তি গ্রহণ করার মানসিকতা থেকে আধিপত্য-অধীনতা সম্পর্কটি জাতিভেদ প্রথার মধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 'দহনকাল' ও 'মোহনা' উপন্যাসে দেখা যায় জেলেদের মধ্যে পেশা অনুযায়ী জাত বিভাজন। হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের থেকে নিজেদের উঁচু জাত বলে মনে করেছে। 'একলব্য' উপন্যাসে একলব্য এক ব্যাধ সন্তান বলে ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণ তাকে অন্ত্যজ শ্রেণি বলে অস্ত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে দেখা যায়, জেলে সন্তান সত্যব্রত তার ভাগ্নিকে শিকলভাঙা গ্রামে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে নিয়ে গেলে নাপিত বিক্রম শীল সত্যব্রতকে জাত তুলে অপমান করে ও জনতা দ্বারা সে প্রহৃত হয়। কারণ নাপিত জাত জেলেদের নিচু জাত মনে করে। তাই অপেক্ষাকৃত নিচুজাতের সেবা করতে তারা নারাজ। সুতরাং দেখা গেলো জাতিভেদ প্রথার নামে নাপিতরা জেলেদের ওপর আধিপত্য প্রকাশ করেছে। 'তুমি কে হে বাপু' গল্পে কর্ম ও গুণের চেয়ে জন্মের পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'সুবিমলবাবু' গল্পে ব্রাহ্মণ্যবাদের মুখোশ খুলে ফেলার প্রবণতা রয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোয় জাতিভেদ প্রথা আধিপত্য অধীনতার দ্ব্যণুক সম্পর্ককে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রাবন্ধিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'Cast and Subaltern Consciousness' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ডোমের পাশাপাশি হাড়িও বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক মতে অন্ত্যজ জাতি। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বাগদী, মুচি, নমশুদ্র বা মালোর তুলনায় এরা যথেষ্ট কম ছিল যা ত্রিশ শতাংশ বা তার বেশি অংশ। সেই জেলার হিন্দু জনসংখ্যা যাদের অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য প্রাবন্ধিক চট্টগ্রামের সমীক্ষার রাঙ্কিং অনুযায়ী জানাচ্ছেন, পারস্পারিক শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য নিম্নবর্ণের মধ্যে উপহাসের প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে হাড়ি ও ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়,

> 'The Dom thinks he is purer than the Hadi, the Hadi thinks he is purer than the Dom. Risley classifies the Hadi as a menial and scavenger class of Bengal proper with whom no one will eat and from whom no one will accept water'. (Guha (ed.) 1989, p. 95)

সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অল্পসংখ্যক বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য বজায় রাখার কৌশল হল জাতিভেদ প্রথার মধ্য দিয়ে তাকে অদৃশ্য ঘোষণা করা। যেমনটা দেখা গেল, 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথরদের অস্পৃশ্যের দৃষ্টিতে দেখার মধ্য দিয়ে। আবার 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জেলেদের ডোম, জাইল্যা বলে বঞ্চনা ও নিপীড়ন করা। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জাতপাতের সারমর্মটি উপলব্ধি করতে গিয়ে দেখেছেন,

…the opposition between purity and pollution. While the need to maintain purity implies that the castes must be kept separate… it also necessarily brings the castes together…The unity of identity and difference—in this case … the unity of purity and pollution—gives us the ground of caste as a totality or system. (Guha (ed.) 1989, p. 180)

তাই, উচ্চবর্ণ বা বংশের কাছে নীচবর্ণের শ্রমজীবী মানুষগুলিকে পুনরুৎপাদন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যাতে তারা তাদের শুদ্ধ অবস্থাকে বজায় রাখার প্রয়োজনে অশুদ্ধ শ্রমজীবীকে অধীনস্ত অবস্থায় পেতে পারে। ধর্মের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ এই লক্ষ্যেই রচিত হয়েছে। (Guha (ed.) 1989, p. 180)

'রামগোলাম' উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে হরিশংকর জলদাস তাই স্বাভাবিকভাবেই মেথরদের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনিকে সংযুক্ত করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্মা মর্তে এসে পথের মাঝে বর্জ্য পদার্থ দেখে বিরক্ত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার শরীরের ময়লা থেকে মহীথরের জন্ম দেন এবং তাকে পথ থেকে বর্জ্য পরিষ্কার করার আদেশ দেন। মহীথর আদেশমাত্র তা সম্পাদন করার পর ব্রহ্মা তাকে মর্ত্যের মানুষদের বর্জ্য পরিষ্কারের মধ্য দিয়ে তার জীবনের সার্থকতার আশিস প্রদান করেন। আলোচ্য উপন্যাসে জানতে পারি উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা।

'এই সম্প্রদায়টি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিতে পারঙ্গম, মানবতার অন্তহীন অপমানে এরা উল্লাস বোধ করে। অনুশাসন নির্মাণের প্রবল ক্ষমতা তাদের হাতে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা মানুষের যুক্তিকে গলা টিপে মারে।...নোংরা কাজে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করার জন্য পুরোহিত গোষ্ঠী শাস্ত্রবাণীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং সার্থক হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের কুযুক্তি মেথর সম্প্রদায়কে হিন্দু জাতিস্তম্ভের নিম্নতম স্তরে ঠেলে দিয়েছে।'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ৩০)

এইভাবেই প্রতিনিয়ত জাতিভেদ প্রথার আড়ালে উচ্চবর্গের দ্বারা সমাজ কাঠামোর একদল মানুষকে কোণঠাসা করে রাখার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়ে চলেছে।

৬.১.৩ নিম্নবর্গ হিসেবে নারীর অবস্থান

নারীর শ্রেণিগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয় থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.২০) কথাবিশ্বে দেখলাম, নারীর প্রতি অবহেলা, দৈহিক শোষণ অর্থাৎ ধর্ষণ, নারীর পণ্যায়ন, অপহরণের মত বিষয়গুলি উঠে এসেছে যা সামাজিক রাজনৈতিক ও কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকেও দায়ী করে। যদিও সামগ্রিক অর্থে নারীর অধীনতা আর বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও বিভিন্ন হিসেবে ধরা পড়েছে। কারণ নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্রে প্রতিবাদী চেতনা লাভ করেছে যা সামগ্রিক অর্থে নারীর চরিত্রে লক্ষণীয় নয়।

আলোচ্য বিষয়টির সাপেক্ষে 'কসবি' উপন্যাস থেকে বলা যায়, পতিতা সমাজে ক্ষমতা, অর্থ ও পেশার ভিত্তিতে যে স্তরায়ণ হয়েছে সেখানে পতিতারা নিম্নবর্গীয় নারী হিসেবে প্রতিপন্ন হলেও মাসিরা অর্থাৎ শৈলবালা মোহিনী বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারী নয়। আবার 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথরসমাজের প্রেক্ষিতে রূপালি যে অর্থে নিম্নবর্গ, অঞ্জলি ও চাঁপারানী সে অর্থে নিম্নবর্গ নয়। নারীর নিম্নবর্গ রূপে প্রতিভাত হওয়ার একটি সার্থক উদাহরণ রয়েছে 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে। গল্পে দুলারি একজন জেলেকন্যা যে শ্যামল দত্তের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে প্রত্যাখ্যান ও বঞ্চিত হয়ে সন্তান নিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। পথে-ঘাটে তাকে ধর্ষণ করা হয়। সভ্য সমাজের প্রতি তার অশ্লীল অশ্রাব্য কুযুক্তি তার এই অভিমানকে প্রকাশ করে। কিন্তু যে তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি তার অভিমান সেই অধ্যাপকের স্ত্রী কিন্তু দুলারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও সমানুভূতিশীল নয়। একথা ঠিক যে অধ্যাপকের স্ত্রী একজন গৃহবধূরূপে তার সীমাবদ্ধতায় বাধা বলে সেও এক প্রকার নিম্নবর্গ। কিন্তু দুলারির মত নারীরা যেভাবে সমাজে প্রত্যাখ্যাত ও ধর্ষিত হয় তা অধ্যাপকের স্ত্রীকে হতে হয়নি। তাই সামগ্রিক অর্থে নিম্নবর্গ ও বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গ নারীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে যা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে স্পষ্টতা পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর অন্যতম বিতর্কিত 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে নারীর সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গ এনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারী তার মৃত স্বামীর চিতায় ভস্ম হয়ে যাওয়াকে সমাজ যে অর্থে 'সতী' হিসেবে দেখেছে, তা আসলে নারীর পতিব্রতা ও পবিত্রতাকে পরিস্ফুট করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা এক অর্থে নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে হত্যা করার উচ্চবর্গীয় কৌশল মাত্র। এখানে তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিটি নারীর ক্ষেত্রেই সমান নয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী বিচার ধারায় একজন নারীর সতীত্ব প্রমানের পথ হিসেবে স্বামীর সঙ্গে সহমরণকে দেখা হয়েছে। (Morris (ed.) 2010, p.269) এক্ষেত্রে নারীর প্রতিবাদের কোনো ভূমিকাই লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু পাশাপাশি স্পিভাক এও দেখিয়েছেন যে আত্মহত্যা যখন কোনো নারী স্বেচ্ছায় করে তখন তার পেছনে থাকে এক পরোক্ষ প্রতিবাদ। নারীর এই নীরব প্রতিবাদে হয়তো কোনো স্বর খুঁজে পাওয়া যায় না, সে হয়তো তার কণ্ঠস্বরের ভাষায় তার প্রতিবাদের কারণকে সর্বসমক্ষে আনতে পারে না বা বোঝাতে অক্ষম হয় কিন্তু প্রতিবাদী হিসেবে নারীকেও নিম্নবর্গীয় চেতনায় ধরা যায়। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি ভুবনেশ্বরী নামক একজন ষোড়শী নারীর আত্মহত্যার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন। সেরকমই হরিশংকরের কথা সাহিত্যেও নারীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে পরোক্ষ প্রতিবাদ লক্ষ করা গিয়েছে।

শুধু গায়ত্রী স্পিভাক নয়, রণজিৎ গুহ তাঁর 'Chandra's Death' প্রবন্ধে চন্দ্র নামক একজন নিম্নবর্গীয় বাগদী নারীর মৃত্যুকে ঘিরে নানা বিবৃতির মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থানের বিষয়টিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। চন্দ্র একজন বাগদী বিধবা যিনি মগারামের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক সমাজের বাগদির আজাদ ও শ্রেণির দিক থেকে সমাজের নিচু স্তরে বিরাজ করে। ফলে চন্দ্র গর্ভবতী হয়ে পড়লে মগারাম তাকে ত্যাগ করে। এই সংকটের মুখে পড়ে চন্দ্রের পরিবার আত্মীয়দের ডেকে একত্রিত করে চন্দ্রের গর্ভপাতের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে রণজিৎ গুহ দুই ধরনের সংহতির কথা বলেন,

এক. পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভয় দ্বারা সৃষ্ট সংহতি।

দুই. পরস্পর বিরোধী নীতি দ্বারা সক্রিয় সহানুভূতিমূলক সংহতি। (Guha (ed.) 1887, p. 166)

মগারাম দ্বারা গর্ভপাত করানোর পরামর্শের মধ্যে ছিল সমাজের ভয় ও মুখ থেকে বাঁচার পথ খোঁজা। কিন্তু চন্দ্রার পরিবারে একত্রিত হাওয়া মহিলাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল চন্দ্রাকে সামাজিক নিন্দা থেকে বাঁচানো। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গর্ভপাতের ঘটনাটি দেখা হয়েছে অন্য নারীর সামাজিক নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য সচেতনভাবে গৃহীত একটি কৌশল হিসেবে। বাগদি সমাজে নারীদের সম্মানের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সংকটে ভগবতী, রঙ্গু, বৃন্দাদের একত্রিত হওয়া পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি কৌশল। সাবঅলটার্ন স্টাডিজে লিঙ্গভেদে নিম্নবর্গের অনুপস্থিতির দিকটি ইঙ্গিত করে গায়ত্রী স্পিভাকের সমালোচনার পর চন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনাটি হল প্রথম ঘটনা যেখানে রণজিৎ গুহ পিতৃতন্ত্রের প্রশ্ন ও মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি দেখান পুরুষতান্ত্রিকতা কীভাবে নারীকে দমন করে এবং নারীরা তা কীভাবে প্রতিরোধ করে। (Guha (ed.) 1887, p. 166)

নিম্নবর্গের ইতিহাসের পর্যালোচনায় স্পিভাক, রণজিৎ গুহ-রা সতীদাহ প্রথা, ভুবনেশ্বরীর আত্মহত্যা, চন্দ্রার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক সমস্যা জনিত অবস্থান তুলে ধরে যেভাবে নারীর দমন ও প্রতিবাদের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি ইতিহাসের পথ বেয়েই হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থানের দিকটিও চিহ্নিত করা যায়। যদিও এক্ষেত্রে 'চরণদাসী' গল্পে চরণদাসীর সঙ্গে হারাধন জলদাসের অবৈধ সম্পর্কের ফলে চরণদাসী গর্ভবতী হয়ে পড়লে হারাধন তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। চরণদাসীকে সম্মানপূর্বক বিয়ে করেছে। তবে নারীকে অবদমিত ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অন্য পন্থায়। 'দুখিনি' গল্পে, 'জলপুত্র' উপন্যাসে নারীর রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ তাকে বিবাহ করলেও পরবর্তীকালে মোহভঙ্গে পুরুষেরা অন্য নারীকে সাঙ্গা অর্থাৎ বিবাহ করে প্রথম স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান

করেছে। 'দুখিনি' গল্পের কিষ্টপদ ও জলপুত্রের মধুরাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হিসেবে নারীকে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে।

৬.২ উচ্চবর্গের 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা যে কেবল নিম্নবর্গকে নিয়ে তা নয়, এর সঙ্গে জুড়ে আছে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ইতিহাসে নিম্নবর্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও সর্বোপরি উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অপরায়ণ কীভাবে হচ্ছে এসবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' আলোচনায় একপর্যায়ে দেখা গেল যে, শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয় চেতনার ওপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজে নিম্নবর্গীয় চেতনার কণ্ঠস্বর পাওয়া যাবে বলে দাবি করলেও সেখানে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে তা আসলে উচ্চবর্গ দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ অন্যের নির্মাণ। সুতরাং উচ্চবর্গের বিপরীতে 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে প্রদর্শন অথবা নির্মাণ করা হচ্ছে এই বিষয়টি গভীর গবেষণার দাবিদার হয়ে উঠল। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ দেখা যাবে, নিম্নবর্গের অপরায়ণ বিষয়টি তৎকালীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- অফিস, আদালত, কারখানা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পুলিশি ব্যবস্থা, আইন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর প্রভৃতির নিরিখে বিশ্লেষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দীপেশ চক্রবর্তীর একটি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও জনসংস্কৃতি'-এ দেখান যে, কী করে ভারতে ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা মহামারীর কবলে জনস্বাস্থ্যের নামে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রদর্শিত করতে চেয়েছিল এই অর্থে যে মহামারী থেকে বাঁচাতে তারা জনস্বার্থে কাজ করছে, কিন্তু খাদ্যশস্য মজুত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদীদের পরোক্ষ সাহায্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের মুনাফা অর্জনের 'হেজেমনি' প্রক্রিয়া চালিয়েছে তারা। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১৬১-৭৮) এ ধরনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস কেবল সমাজতাত্ত্বিকভাবে নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং তা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্র ও বৃহত্তর অর্থে আধিপত্যকামী ক্ষমতাচর্চার ইতিহাস। রণজিৎ গুহর নিম্নবর্গীয় চেতনা স্বাতন্ত্র হলে উচ্চবর্গীয় চিন্তাভাবনা আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তাদের পারস্পারিক বোঝার ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা হল সামাজিক কাঠামোর ক্ষমতার স্তরায়ণ। ক্ষমতার এককেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণাটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। (Guha (ed.) 1982, p. 6-10)

এক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজকে আমরা দেখলাম সেখানে বিশেষ করে 'একলব্য' উপন্যাসে পৌরাণিক মহাভারতের আখ্যানের ভিত্তিতে ব্যাধ সম্প্রদায়ের এক ব্যাধসন্তান একলব্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে ওঠার সংকল্প গ্রহণ করে। আর্য প্রবর্তিত চতুর্বর্ণপ্রথা অনুযায়ী ব্যাধ অর্থাৎ পশুশিকারীরা সমাজ কাঠামোর চতুর্বর্ণ তথা শূদ্র ও অন্ত্যজগোষ্ঠী বলে গুরু দ্রোণ একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে আপত্তি জানিয়েছেন। গুরু দ্রোণের মতে নীচ জাতিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা গুরুর অখ্যাতির কারণ আর তাছাড়া সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী একমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রবিদ্যার উপর অধিকার রয়েছে। অন্ত্যজর সে অধিকার নেই। লক্ষণীয়, এখানে সামাজিক শ্রেণিবিভাজন কিন্তু কখনোই কর্ম ও গুণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে জন্ম ও জাতির উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ মানবরূপে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই বা তার পূর্বেই সেই মানুষের ভবিতব্য বিচার্য হত কেবল এই বর্ণাশ্রম প্রথার দ্বারা। সমাজের উচ্চবর্গ দ্বারা সৃষ্ট এই প্রথা নিম্নবর্গের অপরের পেছনে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের দ্রোণের মুখে এর অভ্যন্তরীণ কারণ অপর হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণকে আরো স্পষ্ট করেছে।

> 'দ্রোণাচার্য ভাবলেন—আর্য সমাজ যে চতুর্বর্ণীয় বিভাজনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, তা অবশ্যই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। এই বিভাজন সমাজকাঠামোকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এই শৃঙ্খল রাজ্যশাসন, প্রজাশোষণ ও ধর্মমার্গের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল।
>
> ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শ্রেণিপ্রথা সমাজে বিরাজমান না থাকলে আর্য সমাজব্যবস্থা কবেই ভেঙে পড়ত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা স্বাধীন। ব্রাহ্মণ্য মস্তিষ্ক আর ক্ষত্রিয়-বাহুবলের সম্মেলনে এমন একটা কেন্দ্রশক্তি তৈরি হয়েছে, যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের সমন্বয়কে অব্যাহত রাখতে হলে এসব ছোটোজাতের শূদ্রদের মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না। (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১০০)

দ্রোণ যিনি উচ্চবর্গের প্রতিভূ তাঁর চিন্তা-চেতনায় মূলত দুটি কথা এখানে গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষণীয়। এক. চতুবর্ণীয় বিভাজনে সমাজ কাঠামোর শৃঙ্খলা রাজ্য ও প্রজা শাসন-শোষণে বিশেষভাবে অনুকূল। এবং দুই. ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত শক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে নিম্নবর্গের মানুষদের মাথা তুলতে না দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করা। গুরু দ্রোণের এই মানসিকতা দুটি দিককে সামনে আনে। প্রথমত, উচ্চবর্গীয় চিন্তা-চেতনায় সর্বদা আধিপত্যকামী মানসিকতার প্রতিফলন দ্বিতীয়ত, উক্ত মানসিকতাকে অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন কৌশলে নিম্নবর্গের অপরায়ণ। দেখা গেল, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' চর্চার যে পর্যায়ে নিম্নবর্গের নির্মাণ কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, সে নির্মাণ পৌরাণিক যুগ থেকে ইতিহাসের বহমানতার খাতে সমানভাবে বয়ে আসছে। শুধু 'একলব্য' নয়, 'যমুনাজলে বিবর সন্ধান' গল্পে

লক্ষ করা গেল চেদিরাজ উপরিচর বসুর বীর্য অদ্রিকা নামক মৎস্যের গর্ভে দুটি পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। রাজা পুত্রসন্তানকে গ্রহণ করে কিন্তু কন্যাটিকে একজন ধীবরের কাছে পালন করার জন্য রেখে আসেন। কারণ পুত্রসন্তান রাজার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য বলে বিবেচিত সমাজে। নারী নয়। তাই নারীকে ত্যাগ করলেন রাজা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর এই অপরায়ণ করার কৌশল একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শুধু তাই নয়, কন্যা সন্তানটি সমাজে বেড়ে উঠতে লাগলে তার রূপলাবণ্যে একদা ঋষি পরাশর তার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করলেন। স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণে মৎস্যগন্ধার প্রতি এই প্রস্তাব অন্যায়সম। কিন্তু উচ্চবর্গের প্রতিভূ পরাশরমুনির প্রকোপের ভয় মৎস্যগন্ধাকে প্রতিবাদহীন করে তুলেছে। পরাশর মৎস্যগন্ধার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে আশীর্বাদস্বরূপ জানান, তার সঙ্গে মিলনে মৎস্যগন্ধার কুমারীত্বের কোনো হানি হবে না। ঋষির আশীর্বাদে তার শরীর থেকে ফুলের গন্ধ তৈরি হবে যা যোজন দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ হবে রাজকীয়। মিলনের বদলে হঠাৎ এত সুখকর প্রাপ্তির আশা আসলে নিজ কার্যসিদ্ধি করা আর উচ্চবর্গীয় কৌশল। তাইতো পরাশরমুনি একটা সময় মৎস্যগন্ধাকে জড়িয়ে ধরলে সে নিষ্ক্রিয় থাকে। দেখা গেল নৌকার মধ্যে মৎস্যগন্ধার শরীর উপভোগ করে মুনি নদীর পাড়ে নেমে নৌকাটিকে নদীর দিকে ঠেলে দেয়। নৌকার পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে থাকে নিস্পলক মৎস্যগন্ধা। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৪৯-৫৭) অর্থাৎ কার্যসিদ্ধির পর নারীকে ত্যাগ করার প্রবণতা ফুটে উঠেছে এখানে যা নিম্নবর্গীয় নারী অপর হিসেবে বিনির্মিত হয়েছে উপন্যাসে।

লক্ষণীয় প্রাচীনকালে সমাজপতিরা বিভাজিত হওয়া থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এর রেশ সমাজে রয়েছে জাতিভেদ রূপে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে বিভাজনও যে নিম্নবর্গের অপরাধের জন্য দায়ী তা আমরা 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'অর্ক', 'জামাইখেকো' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে লক্ষ করেছি। যেখানে জাল ও নৌকার ভিত্তিতে জেলে সমাজের বহদ্দার, পাউন্যা নাইয়া, বিয়ারী ও সাধারণ জেলে হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়। এই অন্তশ্রেণির মধ্যে যেমন অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের জেলে দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জেলেরা বঞ্চিত-শোষিত হয়েছে তেমনই সমগ্র জেলে সমাজও বহিরাগত শক্তির দ্বারা শোষিত হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা যায়, 'জলপুত্র' উপন্যাসে জেলেদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে শুক্কুর ও শশিভূষণ ঋণ দেওয়ার নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে খাতায় হিসেবে গড়মিল করে রাখে। নরম সুরে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শশিভূষণ তাদের ভরসা আদায় করে দিনের পর দিন তারা জেলেদের 'অপর' করে রেখেছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রমণীমোহন আগে-ভাগে তার জাল দিয়ে মাছ তুলে নিয়েছে শর্ত উপেক্ষা করে। অন্নচরণ বহদ্দারও রাধানাথের

অসহায়তার সুযোগ নেয় একইভাবে। শুধু তাই নয়, জালাল মেম্বার রামহরির সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসায় নেমে রামহরিকে প্রচুর মুনাফার লোভ দেখিয়ে তার সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তবুও জেলেরা চুপ থাকে। কারণ জেলে সমাজের নানা নিয়ম ও অনুশাসনের উর্ধ্বে কেউ নয়। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গীয় জেলেরা সর্বদা অনুশাসনের আড়ালে নজরবন্দি। মিশেল ফুকোর মত অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অনুশাসনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জেলেরা শাস্তির ভয়ে বহদ্দার ও ক্ষমতাসম্পন্ন আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। (Gordon (ed.) 1980, p. 139-40) 'অর্ক' উপন্যাসে কীভাবে বলরাম ছোবান মেম্বারকে মাছ দেওয়ার কথা শুনে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। কারণ মাছ নিয়ে সে দাম দেয় না। জানা যায় ছোবান মেম্বার দ্বারা জেলেরা যাবতীয় সরকারি ত্রাণ ও সাহায্য পায় বলে তার বিনিময়ে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ নেয় সে। অর্থাৎ নিরক্ষর অশিক্ষিত ও অধিকার অজ্ঞাত জেলেরা ছোবান মেম্বারকে গুরুত্ব দেয় বাধ্য হয়ে। লক্ষণীয় ছোবানের উচ্চবর্গীয় কৌশল জেলেদেরকে 'হেজেমনি' দ্বারা অধীন করে রেখেছে যা নিম্নবর্গকে অপর করে রাখার কৌশলমাত্র।

আবার 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের নজর পড়ে কুমোরদের শ্মশানের ওপর। কারণ সেখানে সে একটি বাগান বাড়ি নির্মাণ করতে চায়। উচ্চবর্গের প্রতিনিধি আবুল কাশেম কুমোর-মালোদের কাছে শ্মশানটি দাবি করার বদলে অন্য স্থানে এরকম আরেকটি প্রাচীর ঘেরা শ্মশান গড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা জানি আবুল কাশেমের এই প্রস্তাব আসলে হেজেমনির মাধ্যমে বলপ্রয়োগ না করে সকলের সম্মতিতে কার্যসিদ্ধি করা। কিন্তু কুন্তী প্রতিবাদ করলে আবুল তার দলবল নিয়ে ফিরে আসে কারণ সে জানে কুমোরদের এখনই চটানো যাবে না, কারণ সামনে জাতীয় নির্বাচনে কুমোরদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক সন্ধ্যায় কুমোরদের জড়ো করে আবুল তার দলকে ভোট দেওয়ার কথা বলে। এক্ষেত্রেও কুন্তীর প্রতিবাদ তথাকথিত উচ্চবর্গের মানসিকতায় বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে আবুল কাশেম কুমোরদের ওপর শক্তি প্রদর্শন করে তার প্রার্থিত শ্মশানটি জবর দখল করেছে। আবুল কাশেমদের বিপরীতে কুমোর-মালোদের অপরায়ণ হয়েছে।

হরিশংকর জলদাস ইতিহাস ও ভূগোলকে অনেকটা বিস্তৃত করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর লেখায় নিম্নবর্গরা নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত, ছোটো-বড়ো প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্র, তার অনুশাসন এবং যাবতীয় আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী। তাইতো তাঁর কথাবিশ্বে ক্ষমতার কথা যেমন কঠোর ও নির্মম তেমনই প্রতিবাদের ভাষাও রুক্ষ ও সোচ্চার। এখানে নিম্নবর্গের অপরায়ণ যেমন প্রতিনিয়ত ঘটেছে তেমনই এর বিপরীতে নিম্নবর্গ তাদের প্রতিবাদের ক্ষেত্রটিকে সম্মিলিত প্রতিরোধ পর্যন্ত

প্রসারিত করতে পেরেছে। নিম্নবর্গীয় চেতনায় এই প্রতিবাদী সত্তাটি যখনই জাগরিত হয়েছে তখনই আমরা গঙ্গাপদ, হরিদাস, জয়ন্ত, রামগোলাম, কার্তিক, দিবাকর, একলব্য, কর্ণ, মোহনা, দেবযানী, কৈলাস, শিবশঙ্কর, কুন্তীকে পেয়েছি।

হরিশংকরের কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস স্থান পায়নি বরং উঠে এসেছে আজীবন নিম্নবর্গকে দেখে আসা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্যিকারের বাংলাদেশের ইতিহাস। যেখানে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট ইতিহাসের বদলে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের দৈনন্দিনতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবনযাপনের ইতিহাস উঠে এসেছে। কখনো সামাজিক-অর্থনৈতিক অনুশাসনে, কখনো পৌরাণিক ইতিহাসের ভিত্তিতে, কখনো রাজনৈতিক অনুশাসনের আড়ালে প্রতিনিয়ত নিম্নবর্গের অপরায়ণের মধ্য দিয়ে দেখা গিয়েছে এক বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশকে। উচ্চবর্গের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসের তলায় যে অচেনা-অজানা বাংলাদেশের নিম্নবর্গের ইতিহাস চাপা পড়েছিল—তাকেই হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানের বয়ানে তুলে ধরেছেন।

৬.৩ উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি : দুটি স্বতন্ত্র ধারা

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ আলোচনায় রণজিৎ গুহ উল্লেখ করেন যে প্রচলিত ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের রাজনীতির কোনো স্থান নেই। কিন্তু তাঁর মতে রাজনীতির অভিজাত পরিধির সমান্তরালে আরেকটি স্বায়ত্তশাসিত পরিধি ছিল যা নিম্নবর্গের রাজনীতি। সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডে তিনি স্পষ্ট সে কথা জানিয়েছেন-

> 'For parallel to the domain of elite politics there excited throughout the colonial period another domain of Indian politics in which the principal actors were not the dominant groups of the indigerous society or the colonial authorities but the subaltern classes and groups constituting the mass of labouring population and the country that is the people. This was an autonomous domain, for it is neither originating from elite politics nor did its existence depend on the latter.
>
> (Guha (ed.) 1982, p. 4)

অর্থাৎ ঔপনেবেশিক ভারতবর্ষে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা দুটি স্বতন্ত্র হলেও নিরপেক্ষ নয়। ধারা দুটি বৈপরীত্যে বাঁধা এবং বেণীবন্ধের মতো প্রায়শই পরিস্থিতি অনুযায়ী ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে যুক্ত হয় আবার নিজস্ব খাতেও বয়ে চলে। এ ক্ষেত্রে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন যে অভিজাত রাজনীতি তুলনামূলকভাবে আইন ও সংবিধানবাদী, কিন্তু নিম্নবর্গের রাজনীতি আপেক্ষিকভাবে হিংস্র। অভিজাত রাজনীতি সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত অন্যদিকে নিম্নবর্গের রাজনীতি অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত। নিম্নবর্গের রাজনীতি আসলে কী—সে বিষয়ে প্রাবন্ধিক আল্ফ গানভাল্ড নীলসেন জানান যে,

'The political activity of social groups who are adversely incorporated intu determinate power relations.' (Nilsen (ed.) 2015, p. 1)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের রাজনীতি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বোঝায় যারা ক্ষমতার সম্পর্কে প্রতিকূলভাবে অন্তর্ভুক্ত। দুটি রাজনীতির ধারা ঔপনিবেশিক ভারতে বিশেষ প্রকট না হলেও সাবঅলটার্ন স্টাডিজের সমালোচকরা নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা থেকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

ইতিহাসের এই বহমানতা হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে উঠে এসেছে স্পষ্টরূপে। এখানে লেখক কোনো ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং ইতিহাসের নানা উপাদানকে উপেক্ষা করে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে উচ্চবর্গের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। উচ্চবর্গের রাজনৈতিক কৌশল ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করেছি। সুতরাং বর্তমান পরিচ্ছেদ এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমরা শুধুমাত্র সেই ধারা দুটি সংক্ষিপ্ত রূপকে সামনে রাখছি।

'জলপুত্র' উপন্যাসে গঙ্গাপদ দ্বারা শুক্কুর-শশিভূষণের হিসেব জাল করার ঘটনার পর্দা ফাঁস করা এবং একত্রিত হয়ে দাদনদারদের কাছ থেকে ঋণ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত। জেলেদের অসহযোগী চিন্তাভাবনায় শুক্কুর-শশিভূষণ জেলেদের উচিত শাস্তি দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। আমরা জানি উচ্চবর্গের কাছে নিম্নবর্গীয় রাজনীতি তখনই স্বতন্ত্র চেতনা হিসেবে ধরা পড়ে যখন তাদের কর্মকাণ্ডে উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। শুক্কুর-শশিভূষণ জেলেদের মাছ ধরার স্থানে নিজেদের ভাড়া করা মুসলমান জেলেদের দ্বারা জাল পেতে তাদের ভাতে মারার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, তাদের এই অন্যায় কর্মের বিরুদ্ধে গঙ্গাপদ জেলেদের নেতৃত্বে দিলে তাকে কৌশলে হত্যা করে বিদ্রোহের মাথাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

'দহনকাল' উপন্যাসে পাক সৈন্য দ্বারা উত্তরপতেঙ্গা গ্রামটি অবরুদ্ধ হয়, মুক্তিযুদ্ধাদের বিনাশ উপলক্ষ্যে সৈন্যরা জেলেদের ওপর নিরন্তর অত্যাচার-পীড়ন করলে তারা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ করে সাময়িকভাবে। কিন্তু বন্দুক ও মানুষের লড়াইয়ে জয় সবসময় বন্দুকেরই হয়। তাই জেলেদের প্রতিরোধের জবাব দিতে পাকসেনারা উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

'মোহনা' উপন্যাসে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতির দুটি স্পষ্টভেদ লক্ষণীয়। দেখা যায় বরেন্দ্রভূমিতে রাজা দিব্যোক যে কৈবর্ত রাজ্যের পত্তন করেছিলেন তাকে পাল রাজাদের আক্রমণ থেকে প্রতিবার সুরক্ষিত করেছে তার পরবর্তী উত্তরসূরী রাজা ভীমসেন। কিন্তু রামপালের আমলে রামপাল

বুঝতে পারেন ভীমসেনকে সহজে পরাজিত করা সম্ভব নয়। এমন সময় সে ভীমসেনের পালিতপুত্র চণ্ডকের অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারেন। ফলে সে চণ্ডককে তার সেনাপ্রধান করার প্রস্তাব দিয়ে চণ্ডকের সমর্থন প্রার্থনা করেন। এখানে স্পষ্ট রামপালের রাজনৈতিক চাল। পালরা কৈবর্ত রাজ্য আক্রমণ করলে চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা ভীমসেন রামপালের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। কৈবর্ত রাজ্যের পতন হয়। রামপাল রাজনৈতিক কৌশলে ভীমসেনকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখা যায় কর্পোরেশনের বড়োবাবুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামগোলামের নেতৃত্বে মেথররা একত্রিত হয়ে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। উচ্চবর্গের প্রতিনিধি বড়োবাবু আব্দুস ছালাম চাইলে মেথরদের সমূলে উৎখাত করতে পারতেন। কিন্তু প্রথমেই তিনি বলপ্রয়োগ করলেন না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি অভিজাত রাজনীতি তুলনামূলকভাবে আইন ও সংবিধানবাদী। দেখা গেল বড়োবাবু জমাদার হারাধনের বুদ্ধি ও পরামর্শ অনুযায়ী রামগোলামকে সরাসরি জুনিয়র জমাদারের পদে নিয়োগ করেন। কারণ হারাধনের মতে রামগোলাম এই পদে নিযুক্ত হলে রামগোলাম মেথরদের সঙ্গে সবসময় মেলামেশা করতে পারবে না এবং হারাধন তাকে কথার জালে ফাঁসিয়ে ও পয়সার লোভ দেখিয়ে মেথরদের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে বিরত করতে পারবে। কিন্তু উচ্চবর্গের এই রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থ হয় কারণ রামগোলামকে কিনে নেওয়া যায়নি। সে মেথরদের হয়ে নিরন্তর প্রতিবাদ করেছে। শেষে আব্দুস ছালাম তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না জেনে রামগোলাম ধর্মঘট করার হুমকি দেয়। উপন্যাসে তাই দেখা যায় অভিজাত রাজনীতি অনুযায়ী আব্দুস ছালাম মেথরদের চতুর্থ দিনের ধর্মঘটের দিন যোগেশকে খুন করিয়ে সেই দায় রামগোলাম ও যোগেশের ওপর চাপিয়ে পুলিশের হাতে তাদের ধরিয়ে দেয়। মিথ্যে প্রমাণ ও সাক্ষ্য হিসেবে পিওনের বয়ান অনুযায়ী তাদের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে প্রাক-ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক ও উত্তর উপনিবেশিক কালপর্বে সমাজ কাঠামোয় একদল মানুষকে সমাজ ও সময় অনুযায়ী বর্ণ, বিত্ত, বিত্তি-র ওপর ভিত্তি করে যেভাবে নিচের দিকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দেওয়া হয়েছে, বর্তমান সময়পর্বেও এই নির্মাণের পরিবর্তন হয়নি। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের অভিধাগুলো বদলে কখনো শূদ্র, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, দলিত, অপর, ব্রাত্যে পরিণত হয়েছে মাত্র। একজন জেলেসন্তান হওয়ার দরুন জেলেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জীবনযাপন, তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনাকে লেখক যেভাবে বাস্তবতার সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, সে দিক থেকে তিনি ব্যতিক্রমী। রণজিৎ গুহ 'Subaltern studies'-এ উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণাটি সুস্পষ্ট করার পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন-

'...একথা যদি সত্যি হয় যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উৎপত্তি হয়েছিল ইংরেজের শাসনব্যবস্থা থেকেই এবং তার বিকাশ ঘটে ওইগুলিকে আশ্রয় করেই, তাহলে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন হয়েছিল কোনো প্রেরণায়?... কিংবা যদি উচ্চবর্গের প্রতিভাই জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন বা ব্যক্তির সর্দারি ছাড়াও, এবং তাদের নেতৃত্ব ও পরামর্শ উপেক্ষা করেই যে সব ঐতিহাসিক গণসমাবেশ ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা কেমন করে হয়?' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৩১)

এই প্রশ্ন থেকেই নিম্নবর্গের যে একটি রাজনৈতিক আদর্শ ও সত্তা রয়েছে তা বোঝা যায় যা কিনা দীর্ঘদিন উচ্চবর্গ দ্বারা সৃষ্ট ইতিহাসের তলে চাপা পড়েছিল।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যও এই ইতিহাসের ঊর্ধ্বে নয়। তাইতো তাঁর কথাবিশ্বে দেখা গেল অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে বিশেষ দিনে জেলেদের গোপন পরামর্শ নিমিত্তে সমাবেশ, আবার কখনো জেলেরা একত্রিত হয়ে তথাকথিত আধিপত্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগঠন নির্মাণ করে। কখনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুধু জেলেরাই নয়, মেথর সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব গোষ্ঠী সংগঠন ও সর্দার। যার পরামর্শে মেথররা সংগঠিত হয়ে নিজস্ব অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। আবার বেশ্যাপাড়ায় কৈলাসের আগমনে পতিতাদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগরিত হয় যা কালু সর্দারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ নিম্নবর্গের ইতিহাসের সমালোচকরা নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারাটিকে খুঁজে পেতে ঔপনিবেশিক ভারতের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন কারণ সেই ইতিহাস লুকোনো ইতিহাস। কিন্তু একজন সাহিত্যিকের সে বাধা নেই বলেই তিনি নির্দ্বিধায় নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনাকে সমাজ বাস্তবতা ও আখ্যানের প্রয়োজনে স্পষ্ট রূপদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে হরিশংকর তথাকথিত নিম্নবর্গের অধিকারবোধ ও প্রতিরোধের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে লুকোনো ইতিহাসকে সামনে এনেছেন। যেখানে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে অপ্রকাশিত নিম্নবর্গের ইতিহাস।

৬.৪ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার নিরিখে

আমরা জেনেছি, সাধারণ অর্থে নিম্নবর্গ হল ক্ষমতার সম্পর্কে আধিপত্যের বিপরীতে অধীনতাগ্রস্ত অধস্তন গোষ্ঠী। নিম্নবর্গ হল পরিচয়ের অভিজ্ঞতামূলক উপাধির মধ্যে অবস্থান, ক্ষমতা, অধীনতা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে কীভাবে তাদের চিহ্নিত করা হয় তার একটি সমালোচনামূলক বোঝাপড়া, আর নিম্নবর্গ থেকে নিম্নবর্গত্বে অগ্রসর হওয়ার অর্থ একটি পরিচয় থেকে ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তাই সমালোচক নীলসেন মনে করেন, গুহ যে অর্থে সমগ্র জনসংখ্যা থেকে এলিটকে বাদ দিয়ে বাকি অংশকে নিম্নবর্গ বলে নির্ধারণ করেছেন, নিম্নবর্গীয়তা বিষয়টি কিন্তু তার থেকে আরো বেশি পরাধীনতার

সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁর মতে, 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার হত দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে পরাধীনতার বৈশিষ্ট্যের নাম হিসেবে যা শ্রেণি, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বা যে কোনো অন্য উপায়ে প্রকাশ করা হয়। (Nilsen (ed.) 2015, p. 6-7)

নিম্নবর্গীয় চেতনা আলোচনা প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রামশি কথিত নিম্নবর্গের 'Common Sense' কথাটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সাধারণ কর্মী-জনতার মধ্যে সক্রিয় মানুষ ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, এই কর্মকাণ্ডের জগৎকে বোঝার কিছু রূপ জড়িত যা সে তার ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে। কারও মতে সাধারণ জনতার 'common sense'- এর দুটি তাত্ত্বিক চেতনার একটি হল তার কার্যকলাপে নিহিত বিরোধী চেতনা এবং অপরটি হল যা তাকে তার সমস্ত সহকর্মীর সঙ্গে একত্রিত করে। এই পরস্পর বিরোধী চেতনাকে আরো অন্বেষণ করে গ্রামশি উল্লেখ করেছেন,

> '... a conception which manifests itself in action, but occasionally and in flashes- when that is, the group is acting as an organic totality. But this same group has, for reasons of submission and itellectual subordination, adopted a conception which is not its won but is borrowed from another group; and it affirms this conception verbally and believes itself to be following it, because this is the conception which it follows in 'normal times'- that is when its conduct is not independent and autonomous, but submissive and subordinate.' (Hoare (eds.) 1971, p. 327)

পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন গ্রামশির এই মন্তব্যের মধ্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা বিশ্লেষণের একটি সম্ভাব্য সূত্র রয়েছে। তাঁর মতে আমরা নিম্নবর্গীয় চেতনাকে পরস্পরবিরোধী, খণ্ডিত বা কম-বেশি এলোমেলোভাবে একত্রে রাখা সাধারণ জ্ঞান হিসেবে দেখি। এটি একটি অস্পষ্ট ও বহুমুখী ধারণা। নিম্নবর্গীয় চেতনাটি আসলে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গঠিত এবং রূপান্তরিত হয় প্রভাবশালী এবং অধীনস্ত শ্রেণিকে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসে। তাই নিম্নবর্গের সাধারণ জ্ঞান হল দুটি উপাদানের পরস্পর বিরোধী ঐক্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'Common sense' কোনো অনমনীয় এবং অচল কিছু বিষয় নয় বরং এটি ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করছে যা দার্শনিক মতামত দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে সাধারণ জীবনে প্রবেশ করে। অন্যদিকে নতুন ধর্ম ও দর্শন এর নতুন ব্যবস্থার আধিপত্যের উদ্ভব ও আধিপত্যবাদী অধস্তন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সাধারণ অর্থে নিম্নবর্গের স্বয়ংক্রিয় স্বায়ত্তশাসিত উপাদানটি শ্রেণিগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের মুহূর্তে অবিকল বিস্ফোরিত হয় এবং এই মুহূর্তে সমাজের দুটি বিরোধী বিশ্বাস, দুটি বিরোধী ধর্ম, দুটি বিরোধী মতবাদ সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে। (Guha (ed.) 1989, p. 170-71) অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চেতনা আসলে খণ্ড, পরস্পরবিরোধী ও বহুমুখী একটি ধারণা। এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গীয়

চেতনায় প্রগতিশীল মানসিকতা রয়েছে যা তাকে একক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে পরিচয় পরিবর্তনে উৎসাহ যোগায় অর্থাৎ প্রান্ত থেকে মধ্য পর্বে উত্থানের চেষ্টা থাকে। দ্বিতীয়ত নিম্নবর্গীয় চেতনার ধর্মভাব ও নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা যা তার সহকর্মী ও শ্রেণির সঙ্গে একত্রিত বা সংঘবদ্ধ করে গড়ে তোলে শ্রেণিচেতনা।

১৯৯৮ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রথম দিকের সমালোচনাতে নিম্নবর্গীয় চেতনা নিয়ে একটি আপত্তি তৈরি হয়েছিল। আপত্তির পেছনে মূল প্রশ্ন উঠেছিল এই যে, নিম্নবর্গের চেতনা যে একটি স্বতন্ত্র চেতনা একথার মধ্য দিয়ে কি ঐতিহাসিকরা চেতনার পৃথকীকরণ, ও সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নত চেতনার অধিকারী অগ্রগামী শ্রেণির ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন? তাঁরা কি উচবর্গ-নিম্নবর্গের চেতনাকে স্বতন্ত্র ঘোষণা করে এদের মধ্যে তুলনাকে অস্বীকার করছেন? এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ঐতিহাসকের উত্তর হল, নিম্নবর্গের অবস্থান থেকে দেখলে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিবাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে নিম্নবর্গের কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই- এই কথাটি প্রমাণ করাই 'সাব-লটার্ন স্টাডিজের' মূল উদ্দেশ্য। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রধান কাজ হল- প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের সমালোচনা না করে বিরোধী ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র চেতনাকে অনুসন্ধান করা। কারণ,

'বিকল্প ইতিহাসরচনা-পদ্ধতির কোনো পরিপূর্ণ কর্মসূচী নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক দিতে পারেন না।'

(ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১৩)

একজন ঐতিহাসিক বিকল্প ইতিহাস রচনা করতে না পারলেও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হরিশংকর জলদাস সেই বিকল্প ইতিহাস রচনা করেছেন অনেকাংশেই। এখানে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বতন্ত্র প্রকাশ আমরা লক্ষ করেছি। আলোচনার এই পরিসরে নিম্নবর্গের সেই স্বতন্ত্র চেতনাকে হরিশংকরের পাঠকৃতির নিরিখে নিচে তুলে ধরা হল।

৬.৪.১ নিম্নবর্গের প্রগতিশীল চেতনা:

প্রগতিশীল ইতিহাসের প্রথম ব্যাখ্যাই হল মানুষের চেতনার বিকাশ ও অনুন্নত বা পূর্বের অবস্থান থেকে উন্নত চেতনার দিকে ক্রমশ বিকশিত হওয়া। এই বিকাশতত্ত্ব যেমন সমগ্র সমাজ তথা সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি ইতিহাসের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ

শ্রেণিবিভাগ দিতে সমাজে আর্থিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ক্ষমতাশীলের চেতনা ক্রমশ উন্নত হয়ে ওঠে। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের প্রগতিশীল মানসিকতা লক্ষ করা গিয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে।

৬.৪.১.১ শিক্ষায় প্রগতিশীল মানসিকতা

সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের প্রগতিশীল মনোভাব হরিশংকরের বেশিরভাগ উপন্যাস-গল্পে আমরা উঠে আসতে দেখেছি। লক্ষণীয় যে জেলে-মুচি-মেথর-পতিতা-দিনমজুর-গোয়ালা ইত্যাদি সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় পরিবার নিজেদের সামাজিক অবস্থান থেকে তাদের উত্তরসূরিকে মুক্তি দিয়ে এক নবজীবনের দিকে তাদের প্রসারিত করে দিতে চেয়েছে। দেখা যাচ্ছে এই অবস্থান থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে শিক্ষা তথা শিক্ষিত হয়ে চাকরি পাওয়ার মাধ্যমে সভ্য সমাজের স্থান করে নেওয়া। তাইতো 'জলপুত্র' উপন্যাসে স্বামীহীন ভুবনেশ্বরী তার একমাত্র সন্তান গঙ্গাপদকে স্কুলে ভর্তি করায়। উপন্যাসে জানা যায়-

> 'এরই মাঝে ভুবনেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করে—তার ছেলে গঙ্গাপদ পড়াশোনা করবে। হিন্দু-মুসলমানের সন্তানদের মতো সেও শিক্ষিত হয়ে বাপের অপমৃত্যুর দাগ ভুবনেশ্বরীর হৃদয় থেকে মুছে দেবে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৩)

'দহনকাল' উপন্যাসে দেখি রাধানাথ শত কষ্ট করে হরিদাসকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। কারণ সে চায় ছেলে জেলেজীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দিতে। তাইতো রাধানাথের সংকল্প করে-

> '...হরিদাসেরে আঁই পড়াইয়ম। মাছ মারইন্যা জাইল্যা হইতাম দিতাম নো।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩)

আমরা 'কসবি' উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লির মোহিনী মাসিকে দেখা যায়, সে তার সন্তান কৈলাসকে পতিতাসমাজের কলুষিত জীবন থেকে দূরে জলধি গ্রামের মরিয়ম একাডেমিতে শিক্ষা অর্জন করতে পাঠিয়ে দেয় যাতে শিক্ষিত হয়ে তথাকথিত ভদ্রসমাজে নিজের স্থান করে নিতে পারে। অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে লক্ষ করা যায় শিবচরণ স্ত্রীর চাঁপারানী তার ছেলে রামগোলামকে পড়াশোনা শিখিয়ে ভদ্রলোকের মত জীবন দিতে চেয়েছে। তার মতে,

> 'টাট্টি আর আবর্জনা টানার কাজ সে করবে না। অফিসার হবে সে, বউ ছাওয়াল নিয়ে ভদ্রপাড়ায় থাকবে।'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ২৬)

'অর্ক' উপন্যাসে বলরাম জলদাসও তার ছেলে দিবাকরকে শত কষ্ট সহ্য করেও লেখাপড়া শেখায়। বলরামের মা বলরামকেও শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অর্থাভাবে তার স্বপ্ন পূরণ হয় না। কিন্তু নাতি দিবাকরের ক্ষেত্রে সে বলরামকে বলে-

'তুইতো পারলি না বলরাম লেখাপড়া করতে, তোর ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করাস। তাহলে তাদেরকে তোর মত রাক্ষসী সমুদ্রে যেতে হবে না, আমার মতো মাথায় খাড়াং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচতে হবে না। হিন্দুপাড়ার বাবুদের মতো তারা অফিস আদালতে চাকরি করবে। (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১২-১৩)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে শিবশঙ্করকেও দেখা যায় জেলেজীবন থেকে মুক্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে শিক্ষক ও পরে অধ্যাপক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, তার সন্তানদের সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে সে জেলেপাড়া ত্যাগ করে চট্টগ্রাম শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তথাকথিত ভদ্র সমাজে বাস করার শুরু করে।

উপন্যাসের মতো গল্পেও শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন 'কোটনা' গল্পে রামদুলাল মুচি তার ছেলে অশোকের 'দাস' পদবী বদলে 'চৌধুরী' করার অনুরোধ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। কারণ সে জানে নিচুজাতের সমাজে সুযোগ সম্মান মর্যাদা নেই। তাই দাস থেকে চৌধুরী অর্থাৎ পদবী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের চেষ্টা দেখা গিয়েছে রামদুলালের মধ্যে। আবার 'সুবল জেঠা' গল্পে সুবল জেঠা তার দুই ছেলেকে দারিদ্র্যের মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়েছেন যাতে তারা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে বড়ো চাকরি করতে পারে।

তাহলে সমাজের নিম্নবর্গ তাদের সামাজিক অবস্থানকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে উত্তরসূরি অর্থাৎ তাদের সন্তানদের মধ্য দিয়ে। কারণ যে সামাজিক অবস্থানে এতদিন তারা বাস করেছে সেই অবস্থানে জীবন কি পরিমাণ দুর্বিষহ তার পূর্বসূরী জানে বলেই তারা তাদের উত্তরসূরির জীবনকে শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত ও উন্নত করতে চেয়েছে।

৬.৪.২ নিম্নবর্গের কুসংস্কার ও অদৃষ্টে বিশ্বাস :

গবেষক রণজিৎ গুহ জানিয়েছেন, নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হল ধর্মভাব। যদিও ধর্ম বলতে তিনি ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্যকে নির্দেশ করেননি, বরং তিনি বোঝাতে চাইছেন, ধর্ম চেতনার এমন এক বিচ্ছিন্ন অবস্থা যার প্রভাবে জড় বা জীবের কোনো সত্তা বা বাস্তব ভাবনার বিষয়কে যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে না পেরে এক বিষয়ের ওপর আরেক বিষয়ের গুণ বা দোষ আরোপ করে। অর্থাৎ যা বাস্তব তাকে অলৌকিক এবং যা অলৌকিক তাকে অদৃষ্ট বা দৈবশক্তি বলে দ্বিধান্বিত হয়। নিম্নবর্গীয় চেতনার এই ধর্মভাবের ফলে ব্যক্তি তার নিজের কার্যকারিতা ও প্রতিভাকে অন্যের কৃতিত্ব বলে মনে করে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৪৩) নিম্নবর্গীয় চেতনারই বৈশিষ্ট্যকে উদাহরণসহ বোঝানোর জন্য

তিনি জানান, মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা কাব্যের শুরুতেই তাই জানিয়ে দেন যে তাঁর রচনা তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়, বরং যে দেবীর মঙ্গলগাঁথা রচিত হয়েছে তা আসলে দেবীই তাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। অর্থাৎ কবি যন্ত্র এবং দেবী বা অন্য অদৃশ্য কোনো শক্তি হল যন্ত্রী। এই ধরনের ধর্মভাব তখনই জেগে ওঠে যখন নিম্নবর্গের মনে একদিকে আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও উপাদানের অভাবজনিত দুর্বলতা তৈরি হয়। অর্থাৎ একদিকে নিম্নবর্গের অধিকারদাবী ও বিদ্রোহের প্রতিরোধ অন্যদিকে ব্যর্থতা ও হতাশা। এদিক থেকে নিম্নবর্গীয় চেতনায় ধর্মভাবটি আসলে তাদের রাজনীতির একটি উপাদান। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৪৩) হরিশংকরের কথাবিশ্বে কিছু ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের চেতনায় এই ধর্মভাবের পরিচয় পেয়েছি।

'জলপুত্র' উপন্যাসের কামিনী বহদ্দার চরিত্রটির মধ্যে এই ধর্মভাবের দ্বান্দ্বিকতা লক্ষণীয়। কামিনীর প্রতিবাদহীনতার কথা প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসে উঠে এলেও জেলেসমাজ যে যুগ-যুগান্তর থেকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদহীনভাবে জীবনযাপন করে এসেছে তার প্রমাণ উপন্যাসে পাওয়া যায়, যখন গঙ্গা তার মায়ের অপমানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করে। উপন্যাসের ভাষায়,

> 'যে-কাজটা পুরুষ পরম্পরায় জেলেসমাজ করতে পারেনি, সেটা করে দেখিয়েছে আজ গঙ্গা। নানা ছল-চাতুরির আশ্রয়ে উচ্চকোটির মানুষরা তাদের সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরে হীন আচরণ করে আসছে। কেউ কোনোদিন এর প্রতিবাদ করেনি। বরং কপালের লিখন হিসেবে ধরে নিয়ে এসব অত্যাচার-অবিচারকে নীরবে সহ্য করে গেছে।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০২)

'অর্ক' উপন্যাসে বলরাম যখন দিবাকরকে হাইস্কুলে ভর্তি করাতে যায় তখন প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত চক্রবর্তীর বয়ানে জানা যায় যে জেলেরা দীর্ঘকাল ধরে অধীনতার অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবন যাপন করে আসছে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে তার প্রতিবাদহীনভাবে ভীতসন্ত্রস্ত দিন কাটায়। কিন্তু নিম্নবর্গের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্গের যা আচরণ, তা কপালের দোষ বা অলৌকিকতা নয়। তা আসলে নিম্নবর্গের ভীতি ও অক্ষমতা। প্রধান শিক্ষকের কথায় জেলেদের এই অদৃষ্টে বিশ্বাসের কথা ধরা পড়েছে।

> 'দেখ বলরাম, যুগ যুগ ভরে তোমরা তুই তোকারি, গালিগালাজ শুনে আসছ। তোমরা এসব অন্যায়কে ঈশ্বরের বিধান বলে সহ্য করে আসছ। এসব ঈশ্বরের বিধানটিধান কিছু না। এ জন্য দায়ী তোমাদের প্রতিবাদহীনতা।'

(জলদাস ২০১৭, পৃ. ২২)

আবার 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে পারুলবালা যখন পাক সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয় তখন তার মায়ের বিলাপে ধরা পড়ে অদৃষ্টে বিশ্বাসী মনোভাব।

> 'আঁই শেষ, আঁরা শেষ! অ ভগবান, তুঁই আঁরার কোয়ালত্ এই কলঙ্ক লেখি রাখ্যিনা দে না?'

(জলদাস ২০১৬(ক) পৃ. ২৩)

লক্ষণীয় পাকসৈন্যের অন্যায় কৃতকর্মের দোষ ঈশ্বরের বিবেচনার ওপর আরোপ করা হয়েছে। একই রকম ভাবে 'জামাইখেকো' গল্পে ক্ষুদিরাম মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেলে তার স্ত্রী আরতী বিলাপ করে,

> 'ও ভগবান রে! ও ঈশ্বর! আঁর কোয়াল পুইল্যরে ঠাকুর। মা গঙ্গারে, তোঁয়ার কী দোষ গব্যিলাম রে জননী! তুঁই আঁর সোয়ামিরে কড়ি লইলা রে ম!' (জলদাস ২০১৬(ক) পৃ. ৩৭৮)

একথা সত্য যে জেলেদের জীবন বাজি রেখে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হয়।. কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের প্রাণনাশ হতে পারে। তাই বলে জীবন সুরক্ষিত নয়। কিন্তু নিম্নবর্গীয় চেতনায় এই বাস্তব সত্যের বদলে সমুদ্রকে মা গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যা আসলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার বাস্তব ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ধারণার মধ্যে আনতে না পেরে এক বিষয়ে দোষ বা গুণ অপর বিষয়ে আরোপ করেছে নিম্নবর্গ। তাইতো মা গঙ্গাকে পরোক্ষভাবে দোষারোপ করেছেন আরতী ক্ষুদিরামের মৃত্যুর জন্য।

রণজিৎ গুহ জানান, নিম্নবর্গীয় চেতনায় এই কুসংস্কার নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর মতে নিম্নবর্গীয় চেতনায় রাষ্ট্রশক্তি আসলে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার মধ্যে দৃশ্যমান। তাদের চেতনায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে দিয়ে শূন্যস্থান তৈরি হয়, সেই স্থান নিম্নবর্গ পূরণ করে ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক শক্তি দিয়ে। সেই কারণেই ক্ষমতা কাঠামোর একেবারে তলদেশে মানুষেরা একেবারে ওপরতলার মানুষদের ক্ষমতা ও শক্তিকে অলৌকিক বা দৈবশক্তি মনে করে। (Guha (ed.) 1982, p. 13)

৬.৪.৩ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা

রণজিৎ গুহ তাঁর 'Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India' গ্রন্থে উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য ও কৃষক বিদ্রোহের প্রাথমিক দিক আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিবাদী কৃষক চৈতন্যের ছয়টি দিক চিহ্নিত করেছেন। যথা- (১) Negation বা অস্বীকার (২) Ambiguity বা অস্পষ্টতা (৩) Modality বা পদ্ধতি ব্যাখ্যা (৪) Solidarity বা সংহতি (৫) Transmission বা সংক্রমণ ও (৬) Territoriality বা আঞ্চলিকতা। গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> "He identified six 'elementary aspects', as he called them, of the insurgent peasant conciousness: negation, ambiguity, modality, solidarity, transmission and territoriality. The insurgent consciousness useas, first of all, a 'negative consciousness." (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 12)

এ প্রসঙ্গে কৃষকের প্রতিবাদী চেতনাকে রণজিৎ গুহ 'নেতিবাচক চেতনা' বলেছেন এই অর্থে যে, এটির পরিচয় শুধুমাত্র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তিনি আরো বলেন,

> 'The limits of this geographical space were determined, on one hand, negatively by the rebel's perception of the geographical spread of the enemy's authority, that is to say, by a principle of exclusion, and on the other, positively by a notion of the ethnic space occupied by the insurjent community, that is by the principle of solidarity. The intersection of these two spaces defined the territoriality of the insurgency.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 13)

গুহ কথিত উপরোক্ত কৃষকের প্রতিবাদী চেতনার ছয়টি উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'the nation of community'। প্রতিটি উপাদান সম্প্রদায়ের নীতির মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে তার রাজনৈতিক রূপ প্রকাশ করে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাটি ধরা পড়েছে তা কখনো সমষ্টিগত বা কখনো একক হলেও গুহ কথিত প্রতিবাদী চেতনার অধিকাংশ উপাদানগুলি সেখানে ধরা পড়েছে।

ইতিপূর্বে আলোচিত পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি হরিশংকরের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ধরন ও ব্যর্থতার কারণ। 'জলপুত্র' উপন্যাসে শুক্কুর ও শশিভূষণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠার পেছনে জেলেদের 'সংহতি' ও 'সংক্রমণ' অর্থাৎ প্রতিবাদের বার্তার দ্রুত সংক্রমণ ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উপাদানটি ধরা পড়েছে যখন তারা বিজন বহদ্দারের বাড়িতে সঙ্গবদ্ধ হয়ে শুক্কুর- শশিভূষণ শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করে। আবার জেলেদের এই পরিকল্পনার কথা শুনে যখন শুক্কুর- শশিভূষণ ষড়যন্ত্র করে জেলেদের নেতৃত্ব গঙ্গাপদকে হত্যা করেছে। তখন জেলেদের মধ্যে 'পদ্ধতি' নামক উপাদানটি নজরে আসে। যার ফলে জেলেরা শশিভূষণকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গেলেও তাদের সামনে না পেয়ে তাদের খামারটিতে আগুন লাগিয়েছে। আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে পাক-সৈন্যদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার সহ্য করতে করতে জেলেরা যখন দেখল সৈন্যরা তাদের মা-বোনদের ধর্ষণের উদ্যত হয়েছে তখন তাদের মধ্যে 'সংহতি' ও 'সংক্রমণ'-এর উপাদান অনুধাবন করা যায় যা প্রতিরোধের প্রাক্-মুহূর্ত হিসেবে আমরা লক্ষ করেছি। লক্ষণীয় যে সৈন্যদের বিরুদ্ধে তারা সরাসরি প্রত্যাঘাত করেছে। আসলে সৈন্যরা রাষ্ট্রপ্রেরিত মাধ্যম মাত্র। জেলেদের আসল শত্রু পাকিস্তান সরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 'অস্বীকার' বা প্রত্যাখ্যানের মনোভাব দেখা গিয়েছে তাদের আসল শত্রুদের প্রতি। দেখা গেল, আসল শত্রুদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলাকে অস্বীকার করে জেলেরা রাতের অন্ধকারে তাদের নিপীড়কদের প্রতি আঘাত করেছে। এরকমই 'কসবি' উপন্যাসে দেবযানী যখন কালুকে সর্বসমক্ষে ছুরি দিয়ে হত্যা করে তখন তার মধ্যেও 'অস্বীকার' উপাদানটি কাজ করেছে। কারণ সে পতিতাপল্লির দুরবস্থার জন্য যারা দায়ী

তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ শত্রু কালুকে হত্যা করেছে। 'রামগোলাম' উপন্যাসে তাই মেথর সম্প্রদায় তাদের প্রতি সমস্ত অন্যায়ের জন্য কর্পোরেশনের বড়োবাবুকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও অসহযোগের পথে নামে। কিন্তু তাদের শত্রু আসলে রাষ্ট্র প্রশাসক। কারণ প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য বড়োবাবু মেথরদের চাকরিকে সুরক্ষিত রাখতে দেয়নি। ফলে মেথরদের মনে 'সংহতি' বা 'সংক্রমণ'-এর পাশাপাশি 'অস্বীকার'-ও লক্ষ করা যায়। 'একলব্য' উপন্যাসেও লক্ষ করা গেল একলব্য ও কর্ণ তাদের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে এসে দ্রোণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও তাদের দুজনের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে অর্জুনের প্রতি। কারণ তাদের ধারণা অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর রূপে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই দ্রোণ কর্ণ ও একলব্যকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। তাই তারা নিজের চেষ্টায় বীর ধনুর্ধরে পরিণত হওয়ার পর অর্জুনকে নানাভাবে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে 'অর্ক' উপন্যাসের শেষে দেখা যাচ্ছে জেলে সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে আসা ছোবান মেম্বারকে এক রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধা রহমালি তার বাড়ির সামনে খুন করে। এখানে রাষ্ট্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্র প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়েছে। একইভাবে 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে হরগোবিন্দ ক্যাপ্টেন মোর্শেদকে থেকেই তার ও জেলেসমাজের শত্রু মনে করে তাকে হত্যা করেছে। রাষ্ট্রর ক্ষমতার অত্যাচার তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে অনায়াসে।

৬.৫ সারাংশ ও সিদ্ধান্ত

ইতিহাসের কৃষক চেতনাকে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে যে তাত্ত্বিক পরিসর সৃষ্টি হয়েছে তা স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি ভেদে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাস অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিশেষের হয়ে তার কথাবিশ্বকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি একদিকে যেমন নিম্নবর্গের ইতিহাসের সূত্র ধরে নিম্নবর্গের বিনির্মাণ করেছেন তেমনই নিম্নবর্গের চেতনাকেও তার কথাসাহিত্যে তুলে ধরে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' বর্ণিত কৃষক চৈতন্যর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারবার। সুতরাং আলোচনার এই পরিসরে এসে বলতেই হয়, নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরে 'উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলস' খসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কেবল একজন ঐতিহাসিক পালন করেন না বরং একজন নিরপেক্ষ দায়বদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টাও সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যেমন করেছেন হরিশংকর জলদাস। ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার দলিল-দস্তাবেজ যা করতে পারে না তা কিন্তু একজন সাহিত্য নির্মাতা নিম্নবর্গ নির্মাণের কাজটিকে সহজ

করতে পারেন। রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা ও উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণাটির সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন,

> 'যদি নিম্নবর্গের চৈতন্যকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে স্বীকার করা হয় তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কী এবং উচ্চবর্গের চিন্তাভাবনা আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তার সংঘাত ও সমঝোতা—এক কথায়, তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক বুঝবো কোনো তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে?' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩১)

এই সম্পর্ক আমরা বুঝব সমাজ কাঠামোর একটি স্তরে যেখানে ক্ষমতাই শেষ কথা। ক্ষমতার নিরিখেই আধিপত্য ও অধীনতা, শাসন-শোষণের দ্ব্যণুক বৈপরীত্যের অবস্থানকে বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মতে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ পারস্পারিক সম্পর্কটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিকতার বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে না দেখে বরং সাহায্য নিতে পারি সেই সব সাহিত্যের যেখানে নিম্নবর্গীয় চেতনার সত্য ও বাস্তবসমস্ত প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। সুতরাং ইতিহাসের সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণকে উপেক্ষা করেও একজন নিম্নবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গের সাহিত্য রচনাকে 'স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল' হিসেবেই দেখতে হবে। কারণ স্পিভাকের মতো আমাদেরও মনে হয়েছে, এ ধরনের সাহিত্যই পরবর্তীকালে সৃষ্টি করতে পারে নতুন কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ। যদিও সে ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের সঙ্গে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্ত করতে হলে ইতিহাস ও সাহিত্যকে পরস্পরের পরিপূরক করে তোলা প্রয়োজন। তবে এও সত্য যে সাহিত্যকে আকর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে সেখানে হয়তো বাস্তবের বিচ্যুতি ঘটবে, অনেকাংশে কল্পনা স্থান নেবে কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের সামাজিক সত্তার মধ্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সুতরাং এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, নিম্নবর্গীয় চেতনাকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর দৃষ্টিতে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেভাবে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবিন্যাসের শৃঙ্খলকে দেখা হয়েছে তা নিম্নবর্গের ইতিহাস ধারণ করুক এবং সাবঅলটার্ন তত্ত্ব অনুযায়ী তা একজন সাহিত্যিক দ্বারা বিশ্লেষিত হোক। ফলে এ ধরনের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে নিম্নবর্গের এক বিকল্প ইতিহাস লেখা সম্ভব হবে। যেমনটি লেখার চেষ্টা করেছেন হরিশংকর জলদাস। সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার শেষে একজন ঐতিহাসিক এবং একজন সাহিত্যিকের মেলবন্ধনই বর্তমানে আমাদের কাছে প্রত্যাশিত।